Vol- IV | Issue 1 | Rs- 50

বাংলা বিজ্ঞান কথা

জানুয়ারী ২০২৬

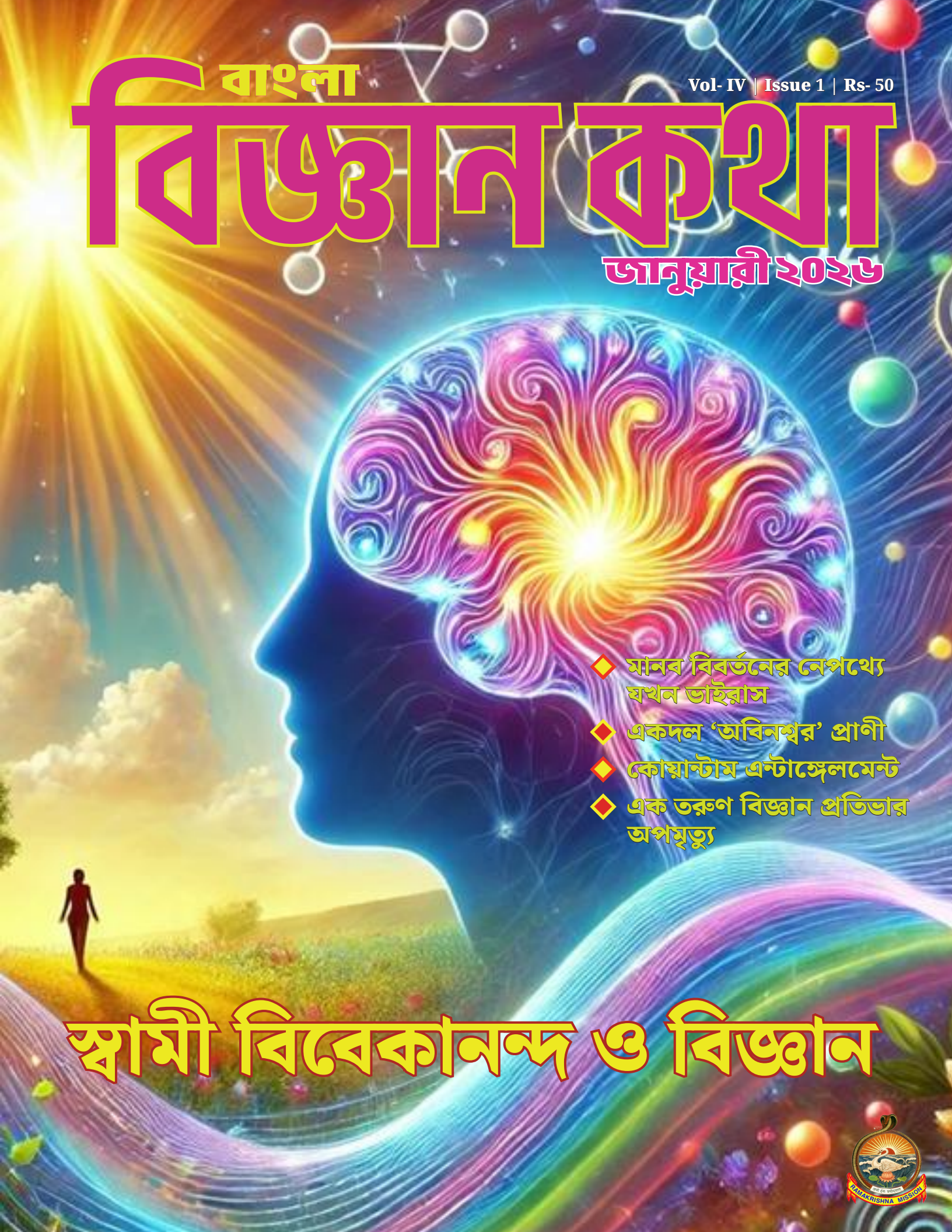

- মানব বিবর্তনের নেপথ্যে যখন ভাইরাস
- একদল ‘অবিনশ্বর’ প্রাণী
- কোয়ান্টাম এন্টাঙ্গেলমেন্ট
- এক তরুণ বিজ্ঞান প্রতিভার অপমৃত্যু

স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান

RAMAKRISHNA MISSION

সূচীপত্র

বিজ্ঞান সংবাদ ৪

স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান: বিশ্বাস যেখানে যুক্তির আলোকে আলোকিত ৬
নকুল পারাশর

ওয়াটসন স্মরণে ৯
অমিতেশ ব্যানার্জী

মানব বিবর্তনের নেপথ্যে যখন ভাইরাস ১১
দীপাঞ্জন ঘোষ

একদল 'অবিনশ্বর' প্রাণী ১৩
সৌরভ সোম

পদার্থবিজ্ঞানীরা পরিমাপ করতে সক্ষম হলেন জটিল কোয়ান্টাম এন্টাঙ্গেলমেন্ট স্টেট ১৬
শামীম হক মণ্ডল

এক উজ্জ্বল শিকারির কথা ১৮
দীপ্তরূপ মল্লিক

এক তরুণ বিজ্ঞান প্রতিভার অপমৃত্যু ১৯
অসিত চক্রবর্তী

তালচটকদের কথা ২৪
অমর কুমার নায়ক

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের জানুয়ারী মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২৬

জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ২৮

কলকাতার আসন্ন বিপদ ৩০

গাছেদের ইন্টারনেট

কানাডার Boreal Forest হলো এমন এক বন, যেখানে গাছগুলো সত্যিই একে অপরের সঙ্গে "কথা বলে", বার্তা পাঠায় এবং একে অপরকে সাহায্যও করে। কোথায় এই রহস্যময় বন? উত্তর কানাডার বিশাল Boreal Forest (Taiga) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বনভূমিগুলোর একটি। এখানে Spruce, Pine, Fir এবং Birch গাছের বিস্তীর্ণ রাজত্ব।

এখন জানা যাক, গাছগুলো কীভাবে কথা বলে? গাছগুলো ভূগর্ভস্থ ছত্রাকের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে। এই নেটওয়ার্ককে বলা হয় Mycorrhizal Network বা "Wood Wide Web"। যেভাবে ইন্টারনেট তারের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে—তেমনি গাছগুলোও ছত্রাকের পাতলা সুতা-সদৃশ গঠন (hyphae) দিয়ে সংযুক্ত থাকে।

কী ধরনের বার্তা পাঠায় গাছ? প্রথমত সতর্কবার্তা। যদি কোনো গাছ পোকা বা রোগে আক্রান্ত হয়, সে শিকড়ের মাধ্যমে রাসায়নিক সংকেত পাঠায়—"সতর্ক হও, বিপদ আসছে!" পাশের গাছগুলো তখন নিজেদের প্রতিরক্ষা রাসায়নিক বাড়ায় ও পাতায় তিক্ততা বৃদ্ধি করে শত্রু পোকাকে দূরে রাখে।

গাছেদের মধ্যে অপর একটি যোগাযোগ হলো পুষ্টি ভাগাভাগি। বড় "মা গাছ" (mother tree) দুর্বল বা ছোট গাছকে বাড়তি নাইট্রোজেন, কার্বন, জল পাঠিয়ে সাহায্য করে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মৃত গাছের শেষ উপহার। গাছ মারা যাওয়ার আগে সে নিজের সংরক্ষিত পুষ্টি নিকটবর্তী গাছগুলোর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

জানতে হবে, কেন গাছ এমন করে? কারণ গাছেরা একা নয়—তারা বনকে একটি সমষ্টি, এক সম্পূর্ণ পরিবার হিসেবে দেখে। প্রতিটি গাছ সুস্থ থাকলে পুরো বাস্তুতন্ত্র সুস্থ থাকে। এই সহজ বিষয়টা গাছের বুঝতে পারে, দুঃখের কথা মানুষ ক্রমশ এই কথাটা ভুলে যাচ্ছে।

কেন এই বিশেষ বনেই এই আশ্চর্য বিষয়টি দেখা যায়? Boreal Forest হলো পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্বন সঞ্চয়াগার, প্রাণী, পাখি ও হাজারো প্রজাতির জন্মস্থান, এবং পৃথিবীর বায়ু পরিশোধনের সবচেয়ে বড় "প্রাকৃতিক ফ্যাক্টরি"। সহজভাবে বললে, কানাডার Boreal Forest হলো এমন এক বন, যেখানে গাছগাছালির নিচে রয়েছে অদৃশ্য ইন্টারনেট, আর গাছেরা সেই নেটওয়ার্কে কথা বলে, সতর্ক করে, আর একে অপরকে বাঁচিয়ে রাখে।

সম্পাদকীয়

স্বাগত নতুন বছর

বাংলা বিজ্ঞান কথার সকল পাঠককে জানাই নতুন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বিশ্বব্যাপী শীর্ষ 200-250টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে স্থান করে নেওয়া, বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (IISc) আজ ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবনের সবচেয়ে সম্মানিত কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি। মহাকাশ এবং পদার্থ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু অধ্যয়ন, জৈবপ্রযুক্তি এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্যন্ত, IISc আধুনিক ভারতের বৌদ্ধিক এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তি তৈরি করেছে। এই বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি কেবল পরীক্ষাগার বা নীতিগত নথিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর পিছনে লুকিয়ে ছিল একটি ভাবনা যা মননশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতের ভবিষ্যতের জন্য গভীর উদ্বেগ থেকে উদ্ভূত।

এক শতাব্দীরও বেশি সময় আগে, 1893 সালে একটি ঐতিহাসিক জাহাজ ভ্রমণের সময় স্বামী বিবেকানন্দ এবং জামশেদজি টাটার কথোপকথন ভারতীয় শিক্ষার গতিপথকে নীরবে পরিবর্তন করে। বিবেকানন্দ এমন প্রতিষ্ঠান তৈরির আহ্বান জানিয়েছিলেন যা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং মৌলিক চিন্তাভাবনাকে এগিয়ে নিতে পারে, যা ভারতীয়দের জাতীয় উদ্দেশ্যে প্রোথিত রেখে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম করে। এই আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে, জামশেদজি টাটা পরবর্তীতে আইআইএসসি-র ভিত্তি স্থাপন করেন—যা দূরদর্শী শিক্ষার শক্তির একটি স্থায়ী প্রমাণ।

সমগ্র দেশ যখন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করতে চলেছে, তখন তাঁর ধারণাগুলি কতটা গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে ভাবা উচিত। বিবেকানন্দ বিজ্ঞান বা আধুনিকতার বিরোধী ছিলেন না; তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতের পুনর্জন্ম বৈজ্ঞানিক যুক্তি, প্রযুক্তিগত ক্ষমতা এবং নৈতিক শক্তির মিলনের উপর নির্ভর করে। তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং চরিত্র, সাহস এবং সৃজনশীলতা তৈরির শক্তি।

আজকের প্রেক্ষাপটে এই দর্শন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত (STEM) শিক্ষায় তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকাশ খুঁজে পায়। ভারতের মতো একটি তরুণ জাতির জন্য, যেখানে অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা 30 বছরের কম বয়সী, STEM শিক্ষা চাকরির পথের চেয়েও বেশি কিছু। স্বাস্থ্যসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা, ডিজিটাল রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুণাবলী সমৃদ্ধ এই ধারাটি সমস্যা সমাধান, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতা লালন করে।

IISc-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি STEM-এ টেকসই বিনিয়োগ কী অর্জন করতে পারে তা প্রদর্শন করে। তারা কেবল স্নাতক তৈরি করে না; তারা এমন ধারণা, প্রযুক্তি এবং সমাধান তৈরি করে যা শিল্প, নীতি এবং সমাজকে প্রভাবিত করে। এটি ভারতের নিজস্ব ইতিহাস থেকে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাকে আরও জোরদার করে যা জাতীয় প্রবৃদ্ধি বিজ্ঞান এবং শিক্ষার প্রতি দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির উপর নির্মিত, স্বল্পমেয়াদী লাভের উপর নয়।

স্বামী বিবেকানন্দের এই দৃঢ় বিশ্বাসও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষাকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, জ্ঞান কেবল অভিজাত কেন্দ্রগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। আজ, এটি গ্রামীণ এবং সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে STEM শিক্ষার প্রসার, ডিজিটাল বিভাজন দূরীকরণ এবং ভৌগোলিক বা দারিদ্র্যের দ্বারা প্রতিভা সীমাবদ্ধ না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

STEM শিক্ষা গণতন্ত্রকেও শক্তিশালী করে। যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধান, প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নতুন ধারণার প্রতি উন্মুক্ততাকে উৎসাহিত করে, এটি একটি বৈজ্ঞানিক মননশীলতাকে উৎসাহিত করে—যা পরবর্তীতে ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত এবং বহুমুখী, প্রগতিশীল সমাজের জন্য অপরিহার্য।

ভারত যখন স্বাধীনতার শতবর্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি অনুপ্রেরণা এবং দিকনির্দেশনা উভয়ই প্রদান করে। তিনি পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণের আহ্বান জানাননি, বরং ভারতের শক্তিতে নিহিত এবং বিশ্বব্যাপী অবদানের লক্ষ্যে স্বনির্ভর জ্ঞান সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছেন। নীতিশাস্ত্র এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে সমন্বিত STEM শিক্ষা এই আদর্শকে মূর্ত করে।

একটি নতুন জীবনযাত্রার সংকল্প নিয়ে আপনাদের সকলকে আবারও নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

ডঃ নকুল পারাশর

বাংলা বিজ্ঞান কথা

Jan 2026 | Vol. IV | Issue 1

উপদেষ্টামণ্ডলী

স্বামী কমলাস্থানন্দ
প্রোঃ বিমল রায়
প্রোঃ অনুপম বসু
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী
ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী

মুখ্য সম্পাদক

ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদকমণ্ডলী

ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী
প্রোঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
প্রোঃ শঙ্করাশিস মুখার্জি
অমিতেশ ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা

রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি 17, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী 110060

ফোন
+91 11 4036 5723

ইমেল
info@shantifoundation.global

ওয়েবসাইট
www.shantifoundation.global

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখকের ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে প্রকাশকের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোনো মুদ্রণ মাধ্যমেই প্রকাশকের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তি তে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনমুদ্রণযোগ্য।

প্রকাশক

রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

এবং

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি ১৭, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী ১১০০৬০

বিজ্ঞান সংবাদ

স্ব-সার প্রয়োগকারী গম

সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এমন গম তৈরি করেছেন যা নিজস্ব প্রাকৃতিক সার তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে, যা পরিবেশ দূষণ এবং কৃষকদের খরচ কমাতে পারে। অধ্যাপক এডুয়ার্ডো ব্লুমওয়াল্ডের নেতৃত্বে গবেষক দলটি

CRISPR জিন সম্পাদনা ব্যবহার করে উদ্ভিদের প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ফ্ল্যাভোন অ্যাপিজেনিন উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই অতিরিক্ত অ্যাপিজেনিন মাটিতে মিশে উপকারী ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিরক্ষামূলক, কম-অক্সিজেন স্তর যুক্ত জৈব-ফিল্ম তৈরি করতে উৎসাহিত করে, যা এনজাইম নাইট্রোজেনেসকে কর্যকর করে তোলে। এটি ব্যাকটেরিয়াকে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনকে গমের ব্যবহারযোগ্য আকারে রূপান্তর করতে সক্ষম করে, যা নাইট্রোজেন স্থিরকরণ নামে পরিচিত। শিমের বিপরীতে, গম গাছ শিম গাছের মতো নাইট্রোজেন-নির্ধারণকারী ব্যাকটেরিয়াকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মূল নোডুলস তৈরি করতে পারে না, তাই কৃষকরা এতদিন মূলত সিন্থেটিক সারের উপর নির্ভর করে এসেছে। তবুও গাছপালা সাধারণত প্রয়োগ করা নাইট্রোজেনের মাত্র 30–50% শোষণ করতে পারে, বাকি সার জল দূষণ, “মৃত অঞ্চল” এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে অবদান রাখে। এই পরিবর্তিত গম খুব কম সার ব্যবহার করেও সাধারণ উদ্ভিদের তুলনায় বেশি ফলন দেয়, যা প্রধান সম্ভাব্য সুবিধার ইঙ্গিত দেয়, বিশেষ করে সেই অঞ্চলে যেখানে কৃষকদের সার কেনা অসুবিধাজনক। বিশ্বব্যাপী নাইট্রোজেন সারের ব্যবহারের প্রায় 18% গম চাষে ব্যবহৃত হয়, তাই সার ব্যবহারে সামান্য পরিমাণ হ্রাসও কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পারে এবং পরিবেশগত ক্ষতি কমাতে পারে। গবেষকরা অন্যান্য শস্য ফসলের জন্যও একই ধরণের পদ্ধতি অন্বেষণ করছেন।

পুরোনো রাসায়নিক চ্যালেঞ্জের সমাধান

সান্টিয়াগো ডি কম্পোস্টেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের CiQUS কেন্দ্রের গবেষকরা একটি অনুঘটক পদ্ধতি তৈরি করেছেন যা প্রাকৃতিক গ্যাসকে মূল্যবান রাসায়নিকে রূপান্তর করার দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জের সমাধান করে। প্রাকৃতিক গ্যাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়

কিন্তু রাসায়নিক উৎপাদনে মূলত কম ব্যবহৃত হয় কারণ এর প্রধান উপাদানগুলি—মিথেন, ইথেন এবং প্রোপেন—অত্যন্ত কম বিক্রিয়াশীল। *সায়েন্স অ্যাডভান্সেস*-এ প্রকাশিত এবং মার্টিন ফানাসের নেতৃত্বে গবেষণায় আবিষ্কৃত নতুন পদ্ধতিটি দক্ষতার সাথে মিথেন এবং সম্পর্কিত গ্যাসগুলিকে বহুমুখী রাসায়নিক বিল্ডিং ব্লকে রূপান্তরিত করতে পারে। গবেষক দলটি অ্যালাইলেশনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। এটি এমন একটি বিক্রিয়া যা গ্যাস অণুতে একটি অ্যালাইল গ্রুপ যুক্ত করে, ওষুধ এবং শিল্প উপকরণ উৎপাদনের জন্য একটি নমনীয় সূচনা বিন্দু তৈরি করে। একটি প্রধান বাধা ছিল অবাঞ্ছিত ক্লোরিনযুক্ত উপজাতের গঠন যা বিক্রিয়ার অভিমুখ পরিবর্তন করে। এটি মোকাবেলা করার জন্য, গবেষকরা কোলিডিনিয়াম ধনাত্মক আয়ন দ্বারা স্থিতিশীল একটি টেট্রাক্লোরোফেরেট ঋণাত্মক আয়নের চারপাশে নির্মিত একটি সুপ্রামলিকুলার অনুঘটক ডিজাইন করেছেন। এই কাঠামোটি একটি হাইড্রোজেন-বন্ধনযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে যা সমস্যাযুক্ত ক্লোরিনেশনকে দমন করার সময় অ্যালকেনের ফটোক্যাটালিটিক সক্রিয়করণ সক্ষম করে। এই পদ্ধতিটি টেকসই এবং দূষণমুক্ত। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীতে গবেষক দলটি সরাসরি মিথেন থেকে জৈব সক্রিয় যৌগ ডাইমেস্ট্রোল সংশ্লেষিত করে দেখান। সম্পর্কিত অগ্রগতির সাথে, এই কাজটি রাসায়নিক উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের আরও পরিবেশবান্ধব, আরও দক্ষ ব্যবহারের দিকে একটি পথ তুলে ধরেছে।

শৈবাল কি প্রবাল প্রাচীরের দখল নেবে?

সম্প্রতি *কমিউনিকেশনস বায়োলজি*-তে প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণায় পাপুয়া নিউ গিনির বিরল প্রবাল প্রাচীর পরীক্ষা করা হয়েছে, যাতে দেখা গেছে যে 2100 সালের মধ্যে সমুদ্রের অম্লীকরণ কীভাবে ক্রমবর্ধমান রিফ ইকোসিস্টেমগুলিকে পুনর্গঠন করতে পারে। সমুদ্রগুলি আরও বায়ুমণ্ডলীয় CO_2 শোষণ করার সাথে সাথে, সমুদ্রের জল ক্রমশ অম্লীয় হয়ে ওঠে, যা প্রবালের ভিত্তিগত চুনাপাথরের কঙ্কালকে দুর্বল করে দেয়। দীর্ঘমেয়াদী বাস্তুতন্ত্র-ব্যাপী প্রভাব পর্যবেক্ষণ করার জন্য অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেরিন সায়েন্স (AIMS) এর গবেষকরা মিলনে উপসাগরের অগভীর আগ্নেয়গিরির ক্ষরণের কাছাকাছি প্রাকৃতিকভাবে উচ্চ CO_2-এর সংস্পর্শে আসা প্রবল প্রাচীরগুলি অধ্যয়ন করেছেন। এই স্থানগুলি ভবিষ্যতের সমুদ্রের অবস্থার বাস্তব-বিশ্বের অ্যানালগ হিসাবে কাজ করে। বরিষ্ঠ লেখক ডঃ ক্যাথারিনা ফ্যাব্রিসিয়াস ব্যাখ্যা করেছেন যে এই "প্রাকৃতিক পরীক্ষাগার" প্রকাশ করে যে কোন প্রজাতিগুলি ক্রমাগত অম্লতা সহ্য করতে পারে। 37টি স্থানে জরিপ করে একটি স্পষ্ট প্রবণতা দেখা গিয়েছে, CO_2-এর মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রবাল হ্রাস পায় যখন মাংসল শৈবাল প্রসারিত হয়, যা শেষ পর্যন্ত রিফগুলিকে দমন করে। গবেষক দলটি শিশু প্রবালের তীব্র হ্রাসও নথিভুক্ত করেছে, যা ধীর রিফ বৃদ্ধি এবং পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দেয়—যা সুস্থ রিফের উপর নির্ভর করে এমন অনেক মাছ এবং মানুষ সহ অনেক প্রজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। সমুদ্রের অম্লতা ইতিমধ্যেই 30% বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং 2100 সালের মধ্যে pH 8.0 থেকে প্রায় 7.8-এ নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বব্যাপী CO_2 নির্গমন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস না পেলে, শৈবাল-প্রধান বাস্তুতন্ত্রের দিকে এটি একটি স্থির পরিবর্তন যা ক্রমে প্রবল বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেবে। ●

মস্তিষ্কের টিউমার নির্মূলকারী নাকের ন্যানোড্রপ

সাম্প্রতিক ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন এবং নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির গবেষকরা গ্লিওব্লাস্টোমা চিকিৎসার লক্ষ্যে একটি নন-ইনভেসিভ ন্যানোমেডিসিন কৌশল তৈরি করেছেন, যা সবচেয়ে মারাত্মক এবং দ্রুত বর্ধনশীল মস্তিষ্কের ক্যান্সার নিরাময় পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি। এই পদ্ধতিতে স্ফিয়ারিক্যাল নিউক্লিক অ্যাসিড (SNA) নামক ইঞ্জিনিয়ারড ন্যানোস্কেল কাঠামো ব্যবহার করা হয়, যা সাধারণ নাকের ড্রপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়, যা মস্তিষ্কের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় করে। ইঁদুরের ওপর করা এই গবেষণায় চিকিৎসা সফলভাবে গ্লিওব্লাস্টোমা টিউমারে পৌঁছেছে এবং শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করেছে, একই সাথে একই ধরণের থেরাপির জন্য সাধারণত প্রয়োজনীয় আক্রমণাত্মক পদ্ধতিগুলি এড়িয়ে গেছে। ফলাফলগুলি PNAS-এ প্রকাশিত হয়েছে। গ্লিওব্লাস্টোমার চিকিৎসা করা কঠিন কারণ থেরাপিউটিক ওষুধগুলি মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে লড়াই করে এবং টিউমারগুলি "ঠান্ডা", যার অর্থ তারা খুব কম প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে। এটি মোকাবেলা করার জন্য গবেষকরা DNA-তে আবরণযুক্ত সোনার কোর সহ SNA ডিজাইন করেছেন যা STING রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় করতে সক্ষম, যা শরীরকে অস্বাভাবিক কোষ সনাক্ত করতে এবং আক্রমণ করতে সহায়তা করে। যখন ইন্ট্রানাসালি সরবরাহ করা হয়, তখন SNA মস্তিষ্কের সাথে নাকের পথগুলিকে সংযুক্ত স্নায়ু বরাবর ভ্রমণ করে, টিউমার-সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধ কোষগুলিতে ঘনীভূত হয় এবং অন্যান্য অঙ্গগুলিকে প্রভাবিত না করে লক্ষ্যযুক্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয়করণকে ট্রিগার করে। টি কোষকে উদ্দীপিত করে এমন ওষুধের সাথে মিলিত হলে, থেরাপিটি ইঁদুরের টিউমার নির্মূল করে এবং পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা প্রদান করে। দলটি এখন ভবিষ্যতের ক্লিনিকাল ব্যবহারের জন্য ন্যানোস্ট্রাকচারের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়গুলি অন্বেষণ করছে। ●

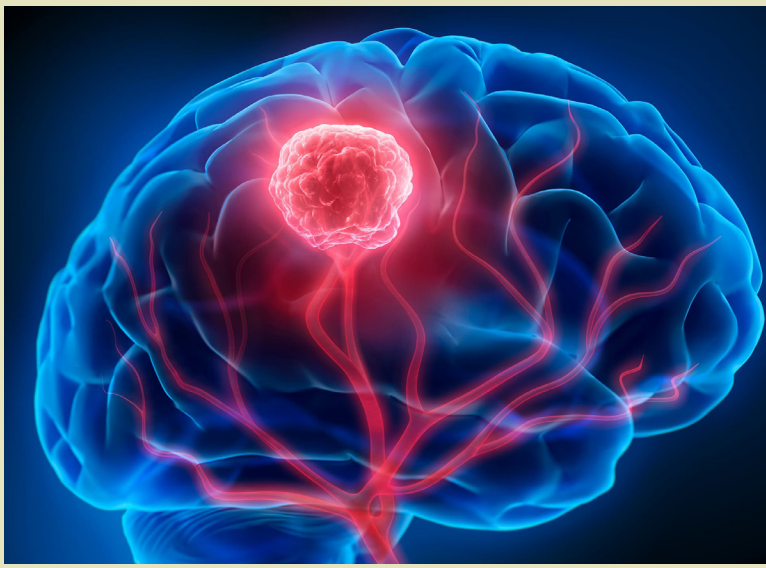

স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান: বিশ্বাস যেখানে যুক্তির আলোকে আলোকিত

নকুল পারাশর

1893 সালে এক শান্ত সমুদ্রযাত্রায়, জাপান থেকে আমেরিকাগামী জাহাজের ডেকে দুই অসাধারণ ভারতীয় একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। একজন ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের বার্তা বিশ্বকে জানাতে যাত্রারত; অন্যজন ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা শিল্পপতি জমশেদজি টাটা—যার স্বপ্ন ছিল ভারতের বৌদ্ধিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। তাঁদের আলোচনা সম্পদ, রাজনীতি বা বাণিজ্য নিয়ে ছিল না। তাঁরা কথা বলেছিলেন জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সেই জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে—যে জাতি যুগ যুগ ধরে প্রজ্ঞা লালন করেছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে যার মন্দিরের থেকেও বেশি প্রয়োজন ছিল ল্যাবরেটরির।

সেই আলাপচর্চা জাহাজেই শেষ হয়ে যায়নি। তা হয়ে উঠেছিল এক অসামান্য স্বপ্নের বীজ—ভারতে এক বিশ্বমানের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন। বহু বছর পর সেই বীজই প্রস্ফুটিত হয় বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (IISc)-এ—যা আজ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র। খুব কম দেশই বলতে পারে যে তাদের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রেরণা এসেছে এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে। ভারত গর্বের সঙ্গে তা বলতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ কখনোই বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা মানেননি। তাঁর কাছে উভয়ই সত্যের সন্ধানী—একটি বহির্জগতের, অন্যটি অন্তর্জগতের। তাঁর শিক্ষা তাঁকে যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণী মন দিয়েছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সেই যুক্তিসন্ধানী স্বভাবকে কখনো নিরুৎসাহিত করেননি, বরং উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাই বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা অন্ধবিশ্বাসকেন্দ্রিক ছিল না; ছিল চিন্তাশীল, পরীক্ষিত এবং বৌদ্ধিকভাবে জীবন্ত। তিনি বিজ্ঞানচর্চার কড়া শৃঙ্খলাকে সম্মান করতেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে মর্যাদা দিতেন এবং বিশ্বাস করতেন ধর্মকে যুক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, নচেৎ সততার সঙ্গে নিজেকে বদলাতে হবে।

পশ্চিমে ভ্রমণকালে বিবেকানন্দ গভীরভাবে বিজ্ঞানের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি শক্তি, পদার্থ ও মহাজাগতিক

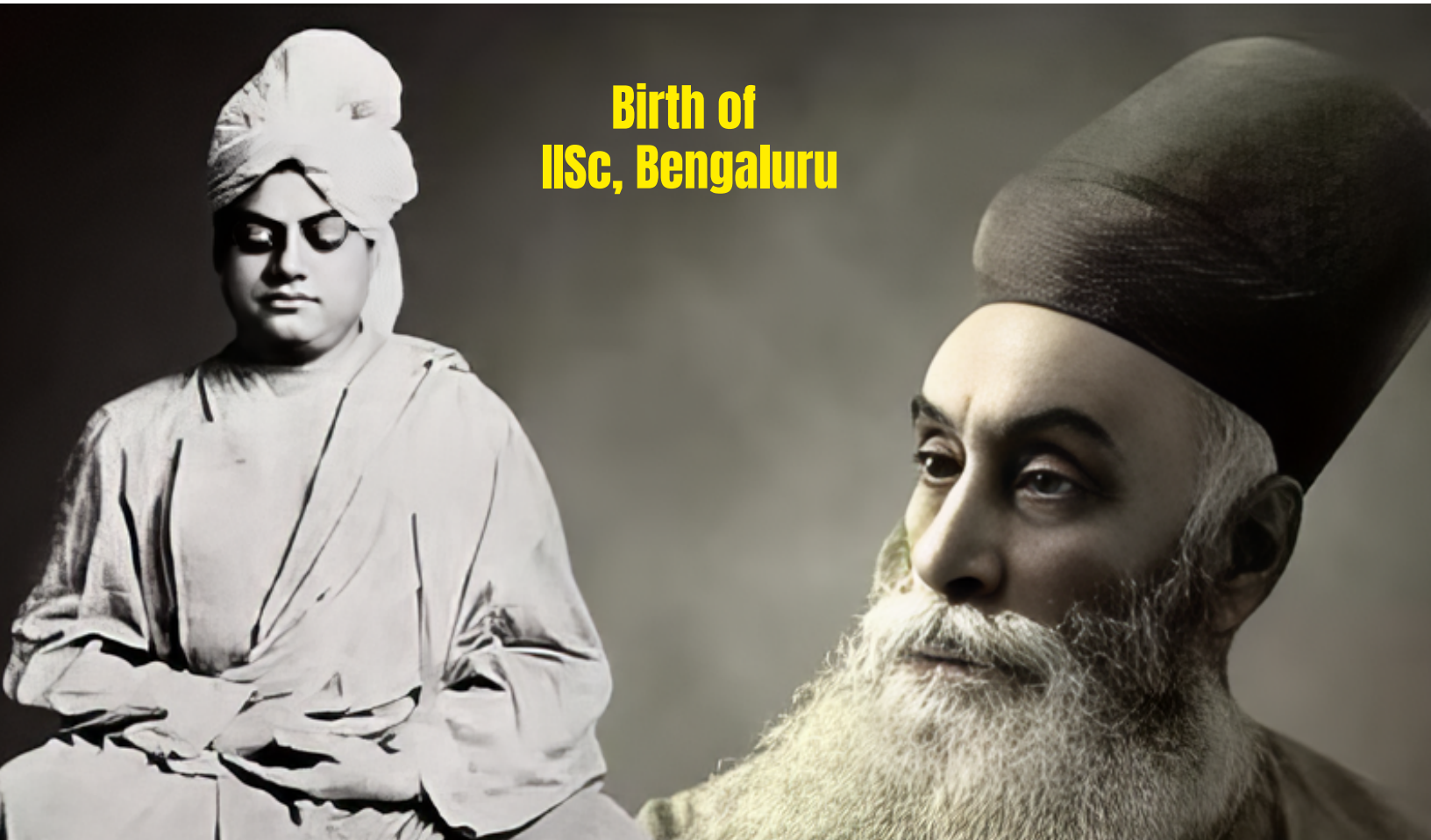

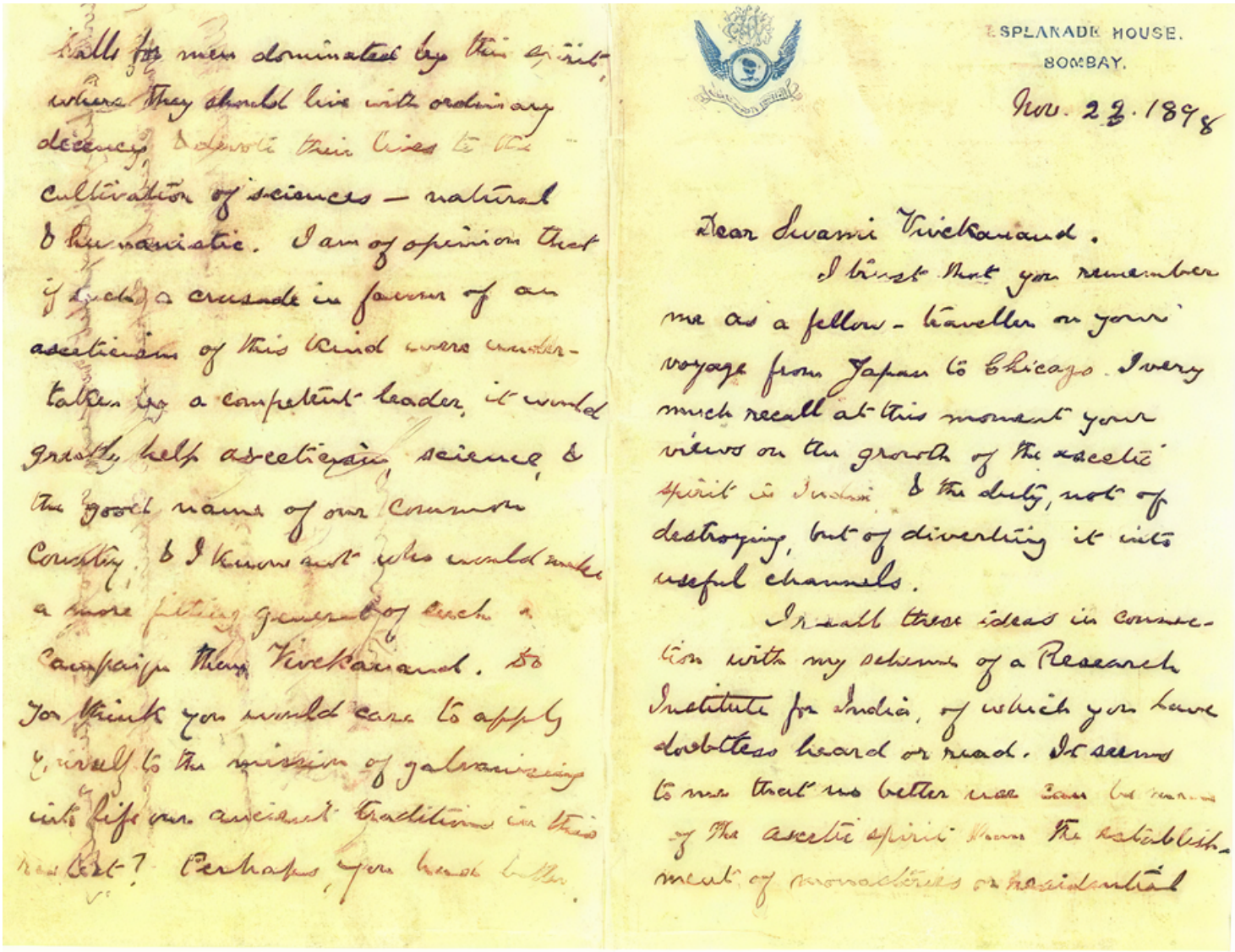

ESPLANADE HOUSE.
BOMBAY.

Nov. 23. 1898

Dear Swami Vivekanand.

I trust that you remember me as a fellow-traveller on your voyage from Japan to Chicago. I very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India & the duty, not of destroying, but of diverting it into useful channels.

I recall these ideas in connection with my scheme of a Research Institute for India, of which you have doubtless heard or read. It seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than the establishment of monasteries or residential

halls for men dominated by this spirit, where they should live with ordinary decency & devote their lives to the cultivation of sciences — natural & humanistic. I am of opinion that if such a crusade in favour of an asceticism of this kind were undertaken by a competent leader, it would greatly help asceticism, science & the good name of our common country; & I know not who would make a more fitting general of such a campaign than Vivekanand. Do you think you would care to apply yourself to the mission of galvanising into life our ancient traditions in this respect? Perhaps, you had better

নিয়ম নিয়ে কথা বলতেন এমন স্বচ্ছন্দতায়, যেন তিনি দার্শনিকই নন, পদার্থবিজ্ঞানেরও এক জ্ঞানী ব্যক্তা। তৎকালীন শীর্ষ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল; তিনি বেদান্তের ধারণার সঙ্গে বিকাশমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন। বিজ্ঞানকে অবমাননা করে আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তিনি মানতেন যে উভয়ই একই পরম সত্যের ভিন্ন ভিন্ন দিক আলোকিত করে।

কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কেবল তাত্ত্বিক ছিল না। তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন—ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ভারতের প্রয়োজন কেবল আধ্যাত্মিক জাগরণ নয়, প্রযুক্তিগত ক্ষমতায়নও। তিনি ভারতীয় তরুণদের আহ্বান করেছিলেন বুদ্ধিবলে শক্তিশালী হতে, আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তুলতে। তাঁর বিশ্বাস ছিল—বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানও মন্দিরের মতোই পবিত্র, কারণ এর কাজও মানবসেবা। তাই জমশেদজি টাটার বিজ্ঞান-দৃষ্টিভিত্তিক স্বপ্নকে তাঁর সমর্থন ছিল ভারতের জাতিগঠনের বৃহত্তর কর্মকান্ডেরই অংশ।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ভাবনার মধ্যে আটকে থাকেনি; তা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল কাজের মাধ্যমে তা এগিয়ে নিয়ে যেতে। এ বিষয়ে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা—ভারতের বৌদ্ধিক ইতিহাসের এক অসাধারণ নারী। বিবেকানন্দের প্রেরণায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন ভারতের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক জাগরণে।

যখন ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাব তীব্র, নিবেদিতা তখন ভারতীয় বিজ্ঞানী ও আন্তর্জাতিক সহায়তার মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরি করেছিলেন। তিনি ভারতের পথিকৃৎ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন; এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। যখন বসু ব্রিটিশ অবহেলা, আর্থিক সংকট ও বৈজ্ঞানিক পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন, তখন নিবেদিতাই তাঁকে সাহস দিয়েছেন, তাঁর গবেষণায় অর্থসহায়তা করেছেন, তাঁর লেখা সম্পাদনা করেছেন এবং ভারতীয় প্রতিভার স্বীকৃতির জন্য নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যখন

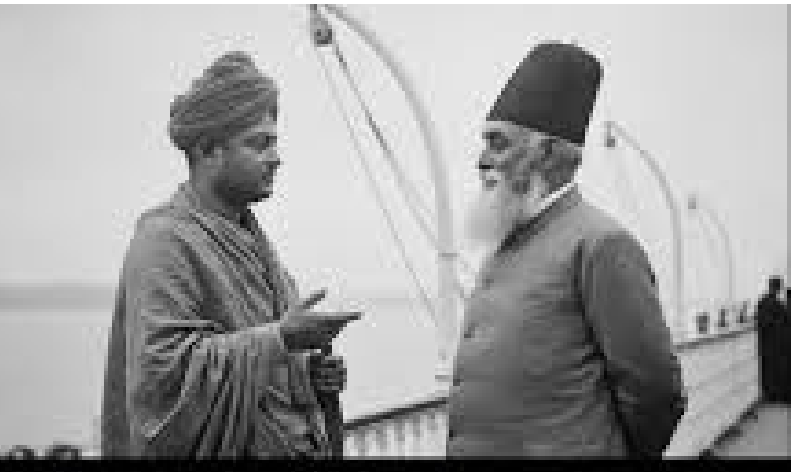

ঔপনিবেশিক মনোভাব ভারতীয়দের সৃজনশীল বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করত, তখন নিবেদিতা সেই সক্ষমতার পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে সোচ্চার হয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের প্রেরণায় নিবেদিতা এমন এক বৌদ্ধিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন, যেখানে বিজ্ঞান হয়ে উঠেছিল জাতীয় মর্যাদার শক্তি। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের শুধু গবেষণা করতে নয়, নিজেদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা এমন এক আবহ তৈরি করেছিল, যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে সি. ভি. রমন, এস. এন. বসুর মতো বিজ্ঞান নেতৃত্ব বিকাশ লাভ করে। তিনি প্রতীক হয়ে ওঠেন বিবেকানন্দের সেই বিশ্বাসের—ভারতে বিজ্ঞানকে বেড়ে উঠতে হবে সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় উদ্দেশ্যকে সঙ্গে নিয়ে।

বিবেকানন্দ বিজ্ঞানকে মানবোন্নয়নের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে দেখেছিলেন, তবে একই সঙ্গে সতর্ক করেছিলেন—নৈতিক ভিত্তি ছাড়া এই শক্তি বিপজ্জনক হতে পারে। প্রযুক্তি যেমন উন্নতি ঘটাতে পারে, তেমনি ধ্বংসও ডেকে আনতে পারে—এ তিনি আগেই ভেবেছিলেন। তাই তাঁর সমাধান ছিল বিজ্ঞানকে ভয় পাওয়া নয়, বরং তাকে মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত করা। তাঁর মতে, বিজ্ঞান সমাজকে আরোগ্য দেবে, উন্নত করবে, ক্ষমতায়িত করবে; কষ্ট কমাবে এবং মানবসম্মান বাড়াবে।

তাঁর কাছে আধ্যাত্মিকতা ছিল বিজ্ঞানের বিবেক। যেমন গবেষণাগার অপক্ক অনুসন্ধানকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করে, তেমনি আধ্যাত্মিকতা সেই জ্ঞানকে রূপান্তরিত করে প্রজ্ঞায়। কোনো সভ্যতার মহত্ত্ব কেবল তার আবিষ্কারে নয়, সেই আবিষ্কার কতটা মানবিক ও দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার হচ্ছে—তাতে নির্ভর করে, এ বিশ্বাসই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চেতনার অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞান

যেমন তিনি বস্তুবিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি বলতেন—আধ্যাত্মিকতাও এক শৃঙ্খলাবদ্ধ "অন্তর্জগতের বিজ্ঞান"। তাঁর কাছে ধ্যান ছিল এক পরীক্ষা; চেতনা ছিল এক অনাবিষ্কৃত জগৎ। আজ যখন স্নায়ুবিজ্ঞান ও চেতনা-গবেষণা দ্রুত

বিকশিত হচ্ছে, তাঁর ভাবনা ভবিষ্যদ্বাণীময় বলে মনে হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন—যেদিন মনকে বোঝা ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হবে, যতটা গুরুত্বপূর্ণ পরমাণুকে বোঝা; সেদিন বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা একই প্ল্যাটফর্মে মিলিত হবে।

যে স্বপ্ন আজও মানবতাকে দিশা দেখায়

স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র 39 বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু তিনি প্রভাবিত করেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্মকে। IISc–এর প্রেরণাদায়ক সেই দেখা, ভগিনী নিবেদিতাকে দেওয়া তাঁর বৌদ্ধিক সাহস, ভারতীয় তরুণদের বৈজ্ঞানিক আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা এবং বিজ্ঞান–আধ্যাত্মিকতার ঐক্যময় দৃষ্টি—সবই আজও ভারতীয় বিজ্ঞানচেতনার প্রাণশক্তি।

আজ যখন প্রযুক্তি অভাবনীয় গতিতে বিশ্বকে বদলে দিচ্ছে, তাঁর বার্তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ—

বিজ্ঞান এগিয়ে যাক নির্ভয়ে, তবে থাকুক মানবিক;
বুদ্ধি হোক আকাশছোঁয়া, তবে থাকুক বিবেক-নিয়ন্ত্রিত;
উন্নতি হোক শক্তিশালী, তবে থাকুক সহানুভূতিশীল।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রমাণ করেছিলেন—প্রয়োগশালা ও মন্দির পরস্পরের বিপরীত নয়; তারা দাঁড়িয়ে আছে মানবাকাঙ্ক্ষার একই তটে, ভিন্ন পথে সত্যকে আলোকিত করে। আর ইতিহাসের কোথাও আজও নীরবে বয়ে চলে সেই জাহাজ—যেখানে একজন সন্ন্যাসী ও একজন শিল্পপতি বহন করছিলেন সেই স্বপ্ন—যেখানে বিজ্ঞান বেড়ে ওঠে আধ্যাত্মিকতার আলোয়, আর আধ্যাত্মিকতা প্রসারিত হয় যুক্তির মর্যাদায়।

লেখক ***ডঃ নকুল পারাশর*** *শান্তি ফাউন্ডেশনের মুল কর্মাধক্ষ্য।*
ইমেল: nakul@shantifoundation.global

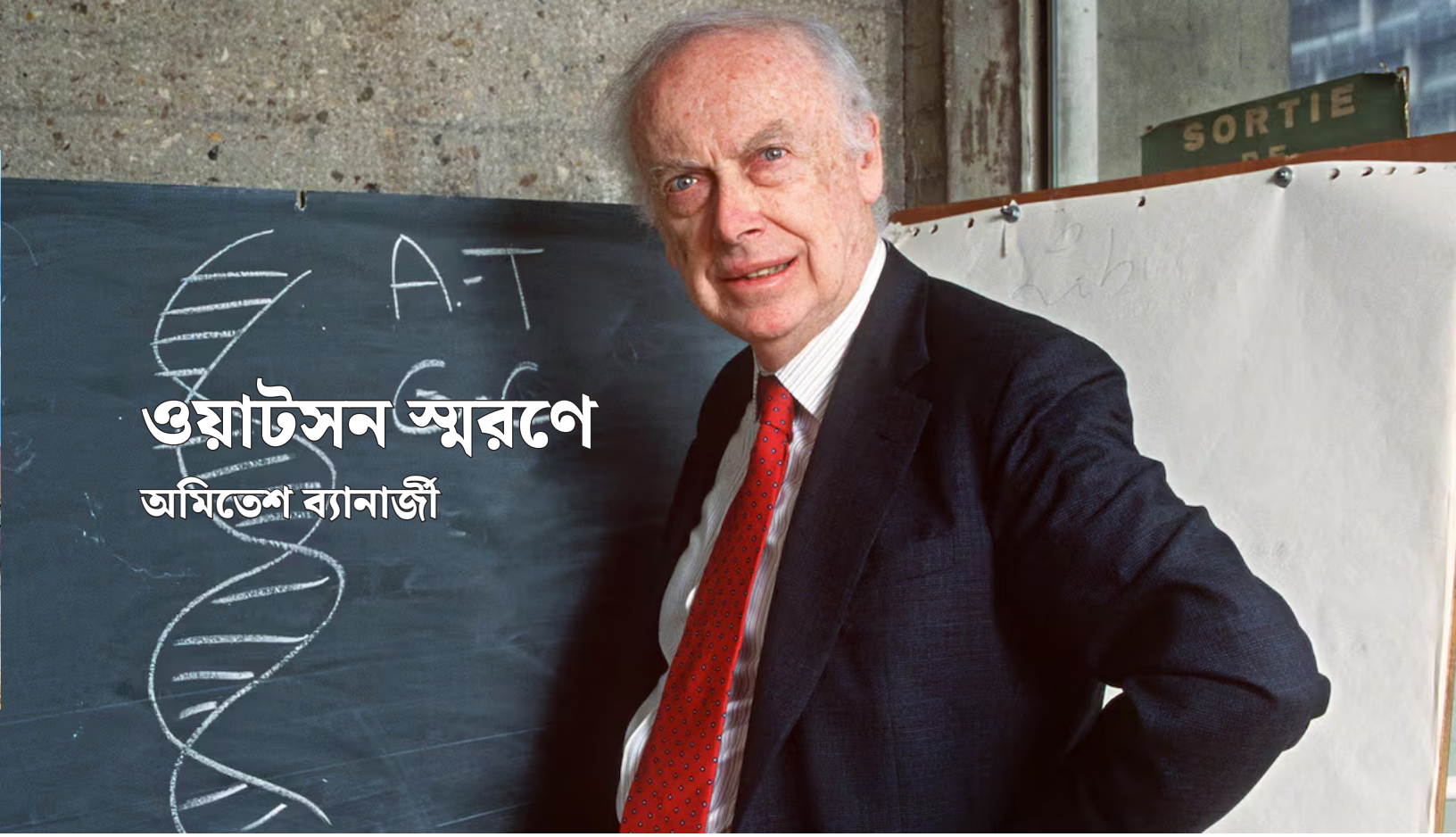

ওয়াটসন স্মরণে

অমিতেশ ব্যানার্জী

গত 6ই নভেম্বর না ফেরার দেশে চলে গেলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেমস ডিউই ওয়াটসন। ওয়াটসনের জন্ম 1928 সালের 6 এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগোতে। তিনি ছিলেন একজন আমেরিকান আণবিক জীববিজ্ঞানী, জিনতত্ত্ববিদ এবং প্রাণিবিজ্ঞানী। 1953 সালে তিনি এবং ফ্রান্সিস ক্রিক রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন এবং রেমন্ড গসলিং-এর গবেষণার উপর ভিত্তি করে "নেচার" পত্রিকায় ডিএনএ অণুর দ্বৈত হেলিক্স কাঠামো প্রস্তাব করে একটি একাডেমিক প্রবন্ধ রচনা করেন। 1962 সালে ওয়াটসন, ক্রিক এবং মরিস উইলকিন্সকে "নিউক্লিক অ্যাসিডের আণবিক গঠন এবং জীবন্ত পদার্থে তথ্য স্থানান্তরের জন্য এর তাৎপর্য সম্পর্কে তাদের আবিষ্কারের জন্য" শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়।

1953 সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ওয়াটসন এবং ক্রিক ডিএনএ-এর দ্বৈত হেলিক্স কাঠামো নির্ণয় করেন। তাদের আবিষ্কারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল লন্ডনের কিংস কলেজে সংগৃহীত পরীক্ষামূলক তথ্য—যা প্রধানত রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন এবং তার সহযোগীরা নির্ণয় করেছিলেন। ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরির (যেখানে ওয়াটসন এবং ক্রিক কাজ করতেন) পরিচালক স্যার লরেন্স ব্র্যাগ 1953 সালের 8 এপ্রিল বেলজিয়ামে প্রোটিন সম্পর্কিত একটি সলভে সম্মেলনে এই আবিষ্কারের কথা প্রথম ঘোষণা করেন। দুঃখের বিষয়, তখন এটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি। ওয়াটসন এবং ক্রিক বৈজ্ঞানিক জার্নাল নেচারে "নিউক্লিক অ্যাসিডের আণবিক কাঠামো: ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিডের কাঠামো" শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র জমা দেন, যা ওই বছর 25 এপ্রিল প্রকাশিত হয়।

1953 সালের এপ্রিলে সিডনি ব্রেনার, জ্যাক ডানিটজ, ডরোথি হজকিন, লেসলি অর্গেল এবং বেরিল এম. অঘটন ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যারা ক্রিক এবং ওয়াটসন দ্বারা নির্মিত ডিএনএ কাঠামোর মডেলটি দেখেছিলেন; সেই সময় তারা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে কর্মরত ছিলেন। নতুন ডিএনএ মডেলটি দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন, বিশেষ করে ব্রেনার, যিনি পরবর্তীতে ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে এবং নতুন আণবিক জীববিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে ক্রিকের সাথে কাজ করেছিলেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংবাদপত্র ভার্সিটি 1953 সালের 30 মে এই আবিষ্কারের উপর একটি ছোট প্রবন্ধ প্রকাশ করে। পরবর্তীতে ওয়াটসন 1953 সালের জুনের প্রথম দিকে, নেচার পত্রিকায় ওয়াটসন এবং ক্রিকের প্রবন্ধ প্রকাশের ছয় সপ্তাহ পরে, 18তম কোল্ড স্প্রিং হারবার সিম্পোজিয়াম অন ভাইরাসে ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স কাঠামোর উপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত অনেকেই তখনও এই আবিষ্কারের কথা শোনেননি। 1953 সালের কোল্ড স্প্রিং হারবার সিম্পোজিয়াম ছিল অনেকের জন্য ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের মডেল দেখার প্রথম সুযোগ। নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন নিয়ে গবেষণার জন্য ওয়াটসন, ক্রিক এবং উইলকিন্সকে 1962 সালে ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল। রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন 1958 সালে মারা যান এবং তাই নোবেল পুরস্কারের নিয়ম অনুসারে তিনি এই পুরস্কারের মনোনয়ন পান নি। ডিএনএর ডাবল হেলিক্স কাঠামোর প্রকাশকে বিজ্ঞানের একটি মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আবিষ্কারের ফলে জীবনের বোঝাপড়া মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং শুরু হয়েছিল জীববিজ্ঞানের আধুনিক যুগ।

ওয়াটসন মাত্র 15 বছর বয়সে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য যোগ দেন এবং শীঘ্রই জেনেটিক্সের প্রতি গভীর আগ্রহ তৈরি হয়। শীর্ষস্থানীয় অণুজীববিজ্ঞানী এবং নোবেল বিজয়ী সালভাদোর লুরিয়ার অধীনে তিনি ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ততক্ষণে ওয়াটসন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে জিনগুলি প্রোটিন দিয়ে গঠিত নয়, বরং

ডিএনএ দিয়ে তৈরি, যেমনটি সেই সময়ে অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন। 1951 সালে নেপলসের একটি সিম্পোজিয়ামের সময় তিনি মরিস উইলকিন্স দ্বারা প্রদর্শিত ডিএনএর একটি এক্স-রে বিবর্তন ছবি দেখে তার এই বিশ্বাস অটল হয়ে ওঠে যে জিনগুলি নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি।

ওয়াটসন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্রাকচারাল কেমিস্ট্রিতে কাজ করার জন্য যেতে চেয়েছিলেন। তার পরামর্শদাতা লুরিয়ার সহায়তায়, তিনি ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে গবেষণা সহকারী হিসেবে একটি পদ লাভ করেন এবং জন কেন্ড্রুর অধীনে মায়োগ্লোবিন প্রোটিন অধ্যয়ন শুরু করেন। ক্যাভেনডিশে আসার পর, তাকে ফ্রান্সিস ক্রিকের সাথে একটি অফিস ভাগ করে নিতে, যিনি তার দৃঢ় বিশ্বাসও ভাগ করে নিয়েছিলেন যে জিনগুলি অবশ্যই ডিএনএ দিয়ে তৈরি। তাদের সহযোগিতার ফলে 1953 সালে নেচারে তাদের ডিএনএ মডেল প্রকাশ পায় এবং গবেষণাপত্রটি জৈবিক চিন্তাভাবনাকে চিরতরে বদলে দেয়। ওয়াটসন পরে স্বীকার করেন যে তিনি "বিজ্ঞান এবং সমাজের উপর ডাবল হেলিক্সের বিস্ফোরক প্রভাব" তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

1953 সালের পর ওয়াটসন ক্যালটেক-এ আরএনএ-এর এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন স্টাডিতে কাজ করেন, তারপর ভাইরাসের কাঠামোগত নীতি নিয়ে আবারও ক্রিকের সাথে সহযোগিতা করার জন্য ক্যাভেনডিশে ফিরে আসেন। পরে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রোটিন সংশ্লেষণে আরএনএ-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বোঝার জন্য কাজ করেন, যা আণবিক জীববিজ্ঞানের উদীয়মান ক্ষেত্র গঠনে সহায়তা করে। 1968 সালে, তাকে নিউ ইয়র্কের কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরির (CSHL) নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। যদিও প্রাথমিকভাবে প্রশাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন না, ওয়াটসন তহবিল সংগ্রহ এবং CSHL-কে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জৈবিক গবেষণা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। তার তত্ত্বাবধানে, একসময় সংগ্রামরত এই প্রতিষ্ঠানটি ক্যান্সার জিনোমিক্স, আণবিক এবং কোষীয় জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ আণবিক জীববিজ্ঞান এবং স্নায়ুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠে। CSHL তার

ওয়াটসন ও ডিএনএ মডেল

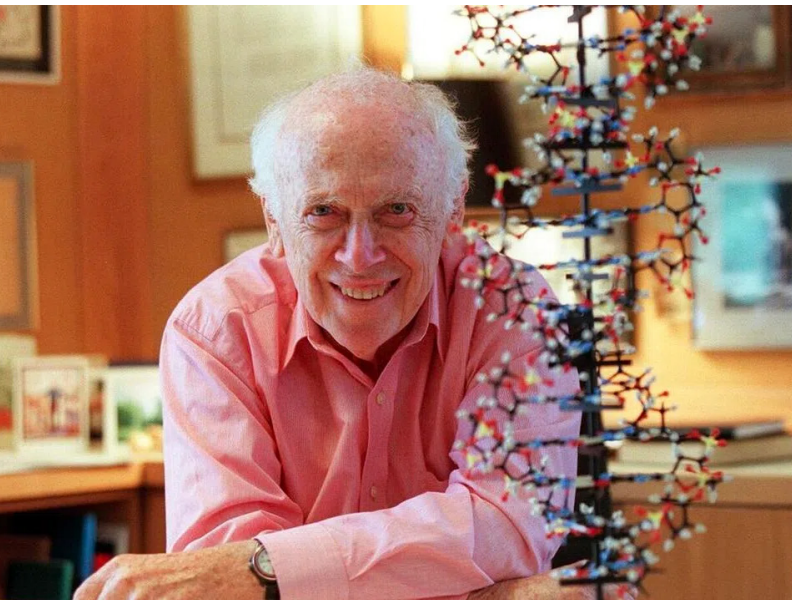

ওয়াটসন (1963)

প্রভাবশালী বৈজ্ঞানিক সভা এবং উন্নত প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্যও বিখ্যাত হয়ে ওঠে, যা ডিএনএ বিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বব্যাপী ভূমিকা পালন করে।

1980-এর দশকের শেষের দিকে যখন জিনোম বিজ্ঞানীরা সমগ্র মানব জিনোম সিকোয়েন্সিং করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন, তখন অনেকেই এই ধারণাটিকে কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু 1990 সালে ওয়াটসনকে বিশাল মানব জিনোম প্রকল্পের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। সেই সময়ে এই কাজটি প্রযুক্তিগতভাবে যথেষ্ট কঠিন ও ব্যায়বহুল ছিল, যা এই প্রচেষ্টাকে ইতিহাসের সবচেয়ে সাহসী বৈজ্ঞানিক উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছিল। এই অসাধারণ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য ওয়াটসনের ইচ্ছা তার নির্ভীক বৈজ্ঞানিক মনোভাবকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। তবে, মার্কিন জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালকের সাথে তীব্র মতবিরোধের পর 1994 সালে তিনি পদত্যাগ করেন। ওয়াটসন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে জিনোমিক তথ্য জনসাধারণের জন্য একটি মুক্ত বিষয় হিসেবেই থাকবে এবং পেটেন্ট বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকবে না—এই অবস্থানটি পরবর্তীতে উন্মুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নিয়মকে রূপ দেয়।

স্বল্প রোগভোগের পর 2025 সালের 6ই নভেম্বর 97 বছর বয়সে নিউ ইয়র্কের পূর্ব নর্থপোর্টে তার মৃত্যু হয়। তার আবিষ্কৃত ডিএনএ-এর গঠন তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

*লেখক **শ্রী অমিতেশ ব্যানার্জী** বিজ্ঞানকর্মী ও এই পত্রিকা প্রকাশনার সাথে যুক্ত।*
ইমেল: amiteshbanerjee1@gmail.com

মানব বিবর্তনের নেপথ্যে যখন ভাইরাস

দীপাঞ্জন ঘোষ

বিজ্ঞানের যুগে বাস করে বর্তমানে কারও আর জানতে বাকি নেই যে, মানুষের শরীর অসংখ্য কোশ দিয়ে তৈরী। আর প্রতিটি কোশের নিউক্লিয়াসে সুরক্ষিত অসংখ্য জিনের মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক বিস্ময়কর তথ্য, যার খানিকটা ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। বাকিটা হয়তো আগামী দিনে প্রকাশ পাবে। মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব কি না সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। তবে, অন্যান্য সব উন্নত জীবের তুলনায় কিছুটা শেষের দিকে উৎপত্তির কারণে '*হোমো সেপিয়েন্স*' (*Homo sapiens*) অর্থাৎ আধুনিক মানবের জিন ভান্ডার বা জিনোম (চিত্র 1) যে বেশ সমৃদ্ধ, সেই বিষয়ে কোন সংশয় নেই। মানব জিনোম বিশ্লেষণের পর দেখা গেছে, আমাদের জিনোমে প্রায় সকল জীবেরই জিন আছে। অমেরুদণ্ডী পতঙ্গ থেকে শুরু করে মেরুদণ্ডী উভচর, সরীসৃপ বা অন্য স্তন্যপায়ী; এমনকি উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস কার জিন নেই আমাদের শরীরে! অহেতুক লম্বা হবে লিস্ট; যদি না এইখানে থামি।

তাহলে ভাবতে অবাক লাগছে, *হোমো ইরেক্টাস* এবং আরও কয়েকটি বানর বংশীয় পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্ট প্রথম সেই আফ্রিকা দেশীয় মানবী (চিত্র 2) নিজের দেহে কত রকম জীবেরই না জিন ধারণ করতেন! মোদ্দা ব্যাপারটার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত মা দুর্গার চণ্ডীরূপে অস্ত্র ধারণের প্রসঙ্গটির তুলনা করা যেতে পারে। অসুর নিধনের উদ্দেশ্যে মা দুর্গাকে যেমন বিভিন্ন দেবতা বিভিন্ন রকম অস্ত্রে সাজিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন, আধুনিক মানব সৃষ্টির সেই প্রথম প্রহরে সম্ভবত প্রকৃতির আশকারা পেয়ে প্রথম মানবীটিকেও সব রকম জিনে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে পৃথিবীর বুকে বারংবার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইতে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রশ্ন, অন্যান্য জীবের জিন মানব শরীরে এল কিভাবে? আর কারা বা এই হোম ডেলিভারি করল?

উত্তরটা হল 'ভাইরাস'। হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন, সাম্প্রতিক অতীতে করোনা আতঙ্কের আবহে সমগ্র মানব জাতির ঘুম কেড়ে নেওয়া প্রায় অদৃশ্যমান জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী বস্তু ভাইরাস! তবে, সেই অর্থে মানুষের সঙ্গে ভাইরাসের সম্পর্ক যদিও

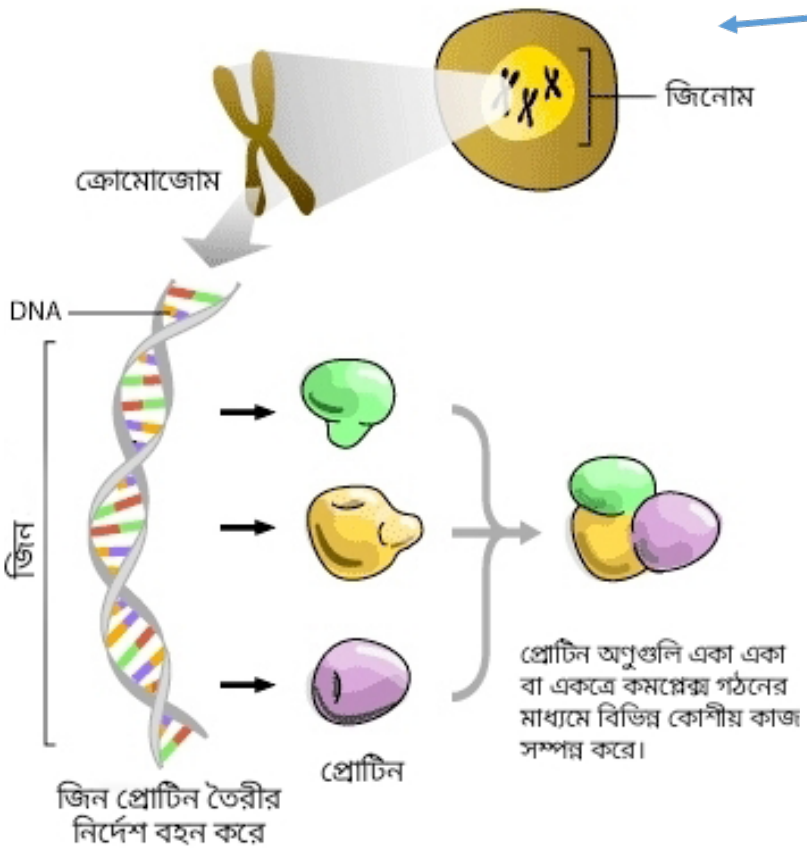

চিত্র 1: জিন অর্থাৎ DNA-র কিছু বিশেষ অনুক্রম, যা নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরীর নির্দেশ বহনের দ্বারা জীবের বৈশিষ্ট্য ও শারীরিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। আর একটি জীবকোশের সমস্ত জিনের সমষ্টিকেই বলা হয় জিনোম।

চিত্র 2: শিল্পীর কল্পনায় দুই মিলিয়ন বছর আগে ইথিওপিয়ার উচ্চভূমিতে বিশ্রামরত প্রথম মানবী এবং তার শিশু কন্যা (সৌজন্যে: দিয়েগো রদ্রিগেজ রোব্রেডো, স্মিথসোনিয়ান ম্যাগাজিন)।

আজকের নয়। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ভাইরাসের সঙ্গে পৃথিবীর সকল জীবের নিবিড় সম্পর্ক। 'নিবিড়' শব্দটা সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহার করলাম কারণ, যে কোন জীবগোষ্ঠী, তা সে উদ্ভিদ, প্রাণী, কিংবা ছত্রাক যাই হোক না কেন, বংশবিস্তারের উদ্দেশ্যে ভাইরাস সকলকেই পোষক হিসাবে ব্যবহার করতে সক্ষম। যে কোন ভাইরাস পোষক জীবদেহে বংশবৃদ্ধির সময় অনেক ক্ষেত্রেই পোষক কোশের DNA-র অংশবিশেষ নিজের জিনোমে অঙ্গীভূত করে ফেলে। এরপর তারা যখন অন্য জীবদেহে আক্রমণ করে, তখন ভাইরাসের DNA-র অংশ হিসাবে পূর্ববর্তী জীবের জিনোম থেকে প্রাপ্ত অথচ অপরিবর্তিত DNA অনুক্রমের কিছু অংশ নতুনভাবে আক্রান্ত জীবের দেহকোশে অর্থাৎ জিনোমে প্রবেশ করে। এই অবস্থায় নতুন ভাবে আক্রান্ত জীবটি যদি নিজের অনাক্রম্যতা শক্তির গুণে ভাইরাসের সংক্রমণকে দেহে সইয়ে নিতে পারে, তাহলেই কেল্লা ফতে! ভাইরাসের খপ্পর থেকে প্রাণরক্ষার পাশাপাশি, অন্য জীবের (প্রথম দফায় আক্রান্ত) কিছু জিন তার জিনোমে স্থান পায়। একইভাবে একটি জীবগোষ্ঠীর বেশ কিছু জীব একই সঙ্গে সংক্রামিত হয়েও নতুন কোন বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে। তারপর তাদের মধ্যে স্বাভাবিক জননের দ্বারা একসময় সমগ্র জীবগোষ্ঠী এবং তাদের অপত্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই নতুন করে পাওয়া জিন বা বৈশিষ্ট্য। ঘটনাটি সময় সাপেক্ষ, তবে বিবর্তনের সাপেক্ষে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত দশকের মানব জিনোম প্রকল্পের সফল গবেষণার সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে, মানবদেহে (চিত্র 3) প্রোটিন তৈরীতে সক্ষম মোট জিনের সংখ্যা 31780 টির মত। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, মানবদেহে পাওয়া যায় এই রকম 1278 ধরণের প্রোটিনের মধ্যে গঠনগত দিক দিয়ে কেবলমাত্র 94 টি প্রোটিন অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রোটিনের সঙ্গে মেলে। তাহলে বাকি বিপুল প্রোটিন এবং তা তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনের একটা বড় অংশই হয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী, নয়তো বা ব্যাকটেরিয়া থেকে এসে থাকতে পারে। এমনকি মানুষের জিন ভাণ্ডারে উদ্ভিদের কিছু জিন থাকার সম্ভাবনাও অযৌক্তিক নয়। জৈব অভিব্যক্তি নিয়ে গবেষণারত জীববিজ্ঞানীদের মতে জিনের সঞ্চারণের পথটা হয়তো এই রকম ছিল: বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া কোশে জিনের সঞ্চারণ ঘটেছিল ফাজ ভাইরাসের আক্রমণের মাধ্যমে। সেইখান থেকে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের মাধ্যমে জিনের সঞ্চারণ ঘটে। তারপর এক সময় জুনোটিক ভাইরাসের দ্বারা অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণী হয়ে শেষে মানুষের পূর্বপুরুষের দেহে ভাইরাস সংক্রমণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে নতুন জিন।

বিবর্তন এবং নৃবিজ্ঞানের গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, আধুনিক মানব সৃষ্টির প্রথম অধ্যায়ে মানব প্রজাতি রূপে নারী জাতির সৃষ্টি হয়। সেই সময় পুরুষ জাতির উৎপত্তি ঘটেনি। একদিকে শারীরবৃত্তীয়ভাবে নারী শরীর যেমন ভাইরাস সংক্রমণের পক্ষে উপযুক্ত, অন্যদিকে আবার হরমোন সহ অন্যান্য কিছু জৈব-রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির কারণে

চিত্র 3: মানব জিনোমে পিতামাতার থেকে পাওয়া জিনের পাশাপাশি অন্যান্য জীবের দেহ থেকে পাওয়া অসংখ্য জিন রয়েছে, যার মধ্যে কিছু জিন বিপাক ক্রিয়া এবং অনাক্রম্যতার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে জড়িত।

নারীদেহ ভাইরাস সংক্রমণের দরুণ সৃষ্ট মৃত্যুর সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, দফায় দফায় ভাইরাসের সংক্রমণ এবং 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জন করে ধীরে ধীরে তা কাটিয়ে ওঠা—আধুনিক মানব সৃষ্টির সম্ভাব্য প্রেক্ষাপট খানিকটা এই রকম হয়ে থাকতে পারে। ●

*লেখক **শ্রী দীপাঞ্জন ঘোষ** বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক, পত্রিকা সম্পাদক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক।*
ইমেল: dpanjanghosh@gmail।com

একদল ‘অবিনশ্বর’ প্রাণী

সৌরভ সোম

কোনো প্রাণী (animal) কি –272° C-এর মতো কম তাপমাত্রায় কয়েক ঘন্টার জন্য বা 150°C-এর মতো উচ্চ তাপমাত্রায় কয়েক মিনিটের জন্য বেঁচে থাকতে পারে? বেশি মাত্রার আয়োনাইজিং তেজস্ক্রিয়তা (ionizing radiation) সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে এমন কোন প্রাণী আছে? দীর্ঘদিন ধরে অক্সিজেনের ঘাটতি এবং জলের অভাব অগ্রাহ্য করে বা 30 বছর খাদ্য এবং জল ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচতে পারে কি? কোনো প্রাণীর পক্ষে কি অনেক ঘন্টা ইথার এবং অ্যালকোহলে নিমজ্জিত অবস্থায় বেঁচে থাকা, বা 600 মেগাপাস্কাল (Megapascal) এর প্রবল চাপ (pressure) সহ্য করা (গভীর সমুদ্রের তলদেশে জলের প্রবল চাপের থেকেও বেশি চাপ), বা কোনরকম সুরক্ষা ছাড়াই মহাকাশে বেঁচে থাকা সম্ভব? বেশিরভাগ মানুষই উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে না বলবেন। কিন্তু গবেষণা প্রমাণ করেছে যে টারডিগ্রেড (tardigrade) নামক মেরুদণ্ডবিহীন, আণুবীক্ষণিক (microscopic) প্রাণীরা উপরিউক্ত সমস্ত পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকতে পারে।

পৃথিবীর সমস্ত জীবিত প্রাণীদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে 35 টি বড় বড় গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলিকে ফাইলাম (Phylum) বা পর্ব নাম দেওয়া হয়েছে। টারডিগ্রেডরা Phylum Tardigrada (ল্যাটিন; tardus, slow, + gradus, step) এর সদস্য; তাদের টেডি বিয়ারের (teddy bear) মতো চেহারার জন্য এবং বাসস্থান হিসাবে জলজ উদ্ভিদ পছন্দ করার কারণে টারডিগ্রেডদের “জল ভালুক” (water bear) নাম দেওয়া হয়েছে। এই অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা (invertebrates) সাধারণত দৈর্ঘ্যে এক মিলিমিটারেরও কম হয় এবং প্রাণীরাজ্যে টারডিগ্রেডরা সন্ধিপদী প্রাণীদের (arthropods অর্থাৎ চিংড়ি, মাকড়সা, কাঁকড়া, আরশোলা, প্রজাপতি ইত্যাদি) নিকটাত্মীয়।

1773 খ্রিস্টাব্দে জার্মান প্রাণিবিজ্ঞানী Johann August Ephraim Goeze টারডিগ্রেডদের আবিষ্কার করেন। 1777 খ্রিস্টাব্দে ইতালিয় জীববিজ্ঞানী Lazzaro Spallanzani এদের নাম দেন টারডিগ্রেড (tardigrade) যার অর্থ যারা ধীরে ধীরে পা ফেলে চলে।

পাহাড়ের চূড়া, গভীর সমুদ্র, গ্রীষ্মমন্ডলীয় বৃষ্টিস্নাত জঙ্গল, অ্যান্টার্কটিকা, মরুভূমি—সব ধরনের পরিবেশে টারডিগ্রেডদের পাওয়া গেছে; লাইকেন, শ্যাওলা ও মস জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে এদের প্রায়শই পাওয়া যায়।

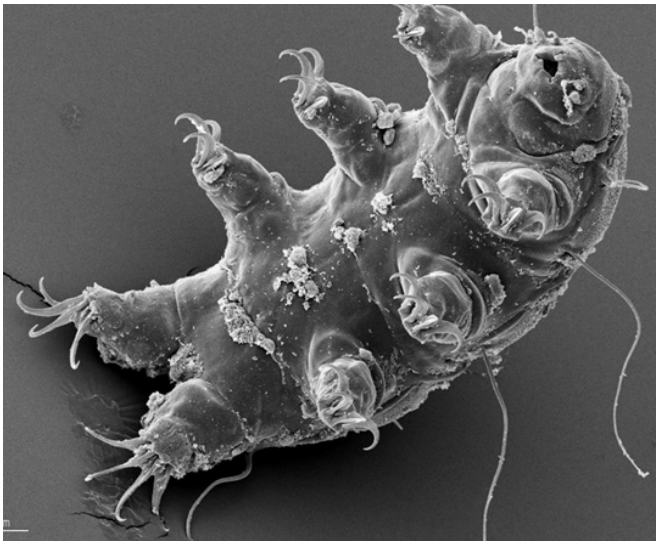

Arthropods অর্থাৎ চিংড়ি, মাকড়সা, কাঁকড়া, আরশোলা, প্রজাপতি ইত্যাদি প্রাণীর দেহে জোড়ায় জোড়ায় সন্ধিল উপাঙ্গ (paired jointed appendages) থাকে যেগুলি কয়েকটি খন্ড জুড়ে তৈরি হয়। টারডিগ্রেডদের দেহ অখণ্ডিত (unsegmented), দেহে চার জোড়া ছোট পা রয়েছে যেগুলি সন্ধিল উপাঙ্গ (jointed legs) নয়। টারডিগ্রেডদের প্রতিটি পায়ে চার থেকে আটটি নখ (claws) রয়েছে। টারডিগ্রেডগুলি শ্যাওলা, লাইকেন এবং ছোট অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহরস (body fluid) ও ব্যাকটেরিয়া খায়। টারডিগ্রেডদের দেহ কিউটিকল (cuticle) নামক এক ধরনের বহিঃকঙ্কাল (exoskeleton) দ্বারা আবৃত থাকে। Chitin নামক এক ধরনের নাইট্রোজেন যুক্ত জটিল কার্বোহাইড্রেট ও কিছু প্রোটিন দিয়ে এদের কিউটিকল তৈরি হয়। টারডিগ্রেডরা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাদের এই কিউটিকল পরিত্যাগ করে ও নতুন কিউটিকল তৈরি করে। টারডিগ্রেডদের মুখছিদ্রকে ঘিরে স্টাইলেটস (stylets) বলে এক ধরনের মুখ উপাঙ্গ থাকে যেগুলির সাহায্যে এরা প্রাণী বা উদ্ভিদ কোশ থেকে তরল পদার্থ খায়। এদের দেহে কোন শ্বসনতন্ত্র (respiratory system) বা সংবহনতন্ত্র (circulatory system) নেই। এরা ব্যাপন প্রক্রিয়ার (diffusion) দ্বারা কিউটিকলের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন নেয়। এদের দেহের মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থ যুক্ত যে তরল পদার্থ থাকে তাকে হিমোলিম্ফ (hemolymph) বলে।

দেহে জলের পরিমাণ খুব কমে গেলে (desiccation) তা বেশিরভাগ প্রাণীর জন্য মারাত্মক। যখন তাদের চারপাশে জলের পরিমাণ খুব কমে যায় তখন টারডিগ্রেডরা একটি

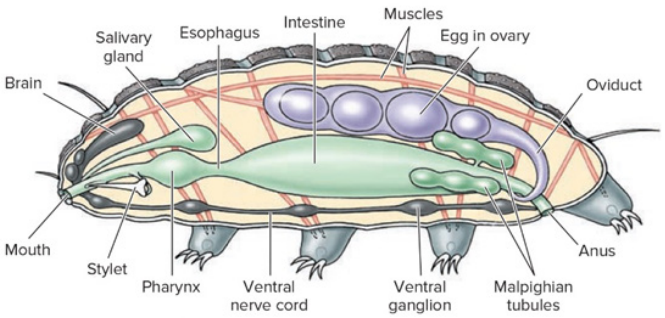

Internal anatomy of a tardigrade.

সুপ্ত (dormant) অবস্থায় প্রবেশ করে; এটি তাদের একটি অভিযোজন (adaptation) যাকে অ্যানহাইড্রোবায়োসিস (anhydrobiosis) বা "জল ছাড়া জীবন" বলে অভিহিত করা হয়। প্রতিকূল পরিবেশে স্থলে বাস করা টারডিগ্রেডরাগুলি এমন একটি সুপ্ত অবস্থায় প্রবেশ করে যেখানে এরা বেঁচে থাকলেও দেহের বিপাক ক্রিয়ার (দেহের মধ্যে ঘটে চলা সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া কে একসাথে বিপাক বা metabolism বলা হয়) বাহ্যিক লক্ষণগুলি আর তাদের মধ্যে দেখা যায় না (a state of suspended animation); এবং দেহে জলের পরিমাণ খুব কমে যায়। টারডিগ্রেডদের এই অবস্থাকে ক্রিপটোবায়োসিস (cryptobiosis) বা "টুন" অবস্থা (tun state) বলা হয়। এই 'টুন' অবস্থায় এদের দেহে বিপাক ক্রিয়ার হার স্বাভাবিক অবস্থার 0.01 শতাংশ হয়ে যায়, এরা এদের মাথা এবং পা গুলিকে গুটিয়ে নেয় এবং আপাত দৃষ্টিতে তখন এদের প্রাণহীন বস্তু বলে মনে হয়। এই ক্রিপ্টোবায়োসিস অবস্থায় থাকাকালীন টারডিগ্রেডরা দীর্ঘস্থায়ী কঠোর পরিবেশগত অবস্থা অনায়াসে সহ্য করতে পারে। "টুন" অবস্থায় থাকাকালীন টারডিগ্রেডরা +150°C থেকে –272°C তাপমাত্রা, আয়োনাইজিং বিকিরণ (যেমন X-ray, Gamma ray বা আলফা কণা), অক্সিজেনের ঘাটতি, ইথার এবং অ্যালকোহলে নিমজ্জন এবং অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা প্রতিরোধ করে বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে। আবার, জলের সংস্পর্শে এলে টারডিগ্রেডরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের এই সুপ্ত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে এবং চলাফেরা ও খাদ্য গ্রহণ করতে শুরু করে। তাদের সক্রিয় অবস্থায়, টারডিগ্রেডদের দেহে ওজন হিসাবে প্রায় 85% জল থাকে, কিন্তু দরকার হলে তারা দেহের মোট ওজনের 2% এর কম জল ধারণ করে সুপ্ত অবস্থায় অত্যন্ত শুকনো পরিবেশে এক দশক বা তার বেশি সময় ধরে বেঁচে থাকতে পারে।

দেহে জলের অভাব ঘটলে টারডিগ্রেডরা trehalose নামক একটি ডাইস্যাকারাইড (disaccharide যেটি এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট) এবং intrinsically disordered proteins (IDPs) ব্যবহার করে [এই প্রোটিনগুলি জলে

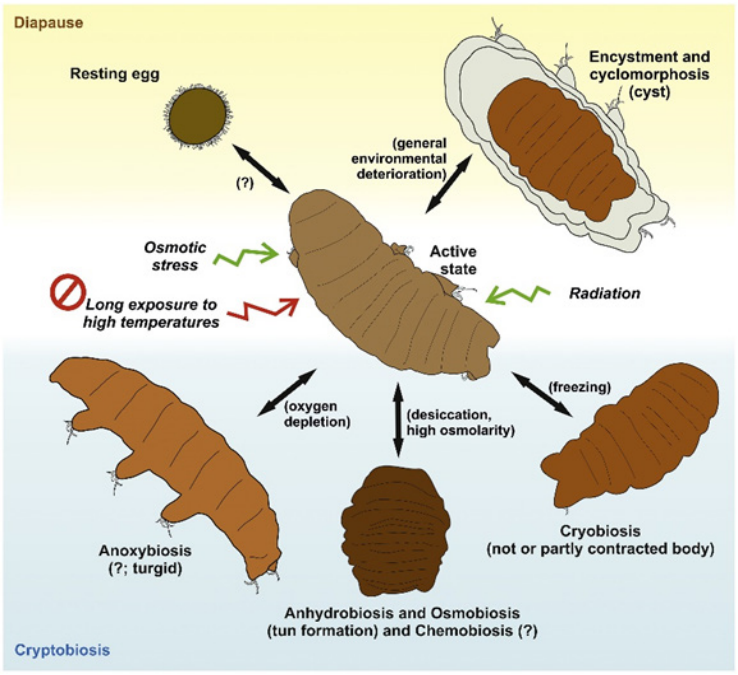

দ্রবীভূত হতে পারে এবং প্রায়শই এদের কোন নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক (3-D) গঠন থাকে না] তাদের কোশগুলিকে রক্ষা করে। জলহীন প্রতিকূল পরিবেশে intrinsically disordered protein গুলি টারডিগ্রেডদের কোশে কাঁচের মতো এক ধরনের ধাত্র (matrix) তৈরি করে যা প্রতিকূল পরিবেশে টারডিগ্রেডদের কোশগুলিকে রক্ষা করে। টারডিগ্রেডদের কোশগুলিতে 'damage suppressor protein' বা Dsup নামক এক ধরণের প্রোটিন তৈরি হয় যা তাদের ডিএনএকে (DNA) আয়োনাইজিং বিকিরণের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে; এই প্রোটিনটি অন্য কোন প্রাণীর দেহে তৈরি হয় না।

2007 খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে "টুন" অবস্থাপ্রাপ্ত কিছু টারডিগ্রেডদের দশ দিনের জন্য পৃথিবীর কক্ষপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে তারা প্রবল ঠান্ডা ও ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মির (UV Ray) সংস্পর্শে এসেছিল কিন্তু পৃথিবীতে ফেরার পর জলের সংস্পর্শে এসে বেশিরভাগ টারডিগ্রেড আধঘণ্টার মধ্যে তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিল এবং তাদের প্রজনন ক্ষমতার কোন হ্রাস হয় নি। 2011 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে টারডিগ্রেডদের আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পাঠানো হয়েছিল। মহাজাগতিক বিকিরণের সংস্পর্শে এসেও তাদের মধ্যে তেমন কোন ক্ষতিকারক প্রভাব দেখা যায় নি।

বিজ্ঞানীরা "টুন" অবস্থাপ্রাপ্ত কিছু টারডিগ্রেডদের নাইলনের (nylon) ফাঁপা বুলেটের (bullet) মধ্যে রেখে এক ধরণের বিশেষ বন্দুকের (two-stage light gas gun যা পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়) মাধ্যমে বুলেটগুলি খুব দ্রুতবেগে দেয়ালের দিকে ছুড়ে পরীক্ষা করেছেন । তাঁরা দেখেছেন যে 900 মিটার/সেকেন্ড বেগে গতিশীল বুলেট যখন লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে এই ছোট্ট প্রাণীগুলি সেই ধাক্কা (impact) সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে।

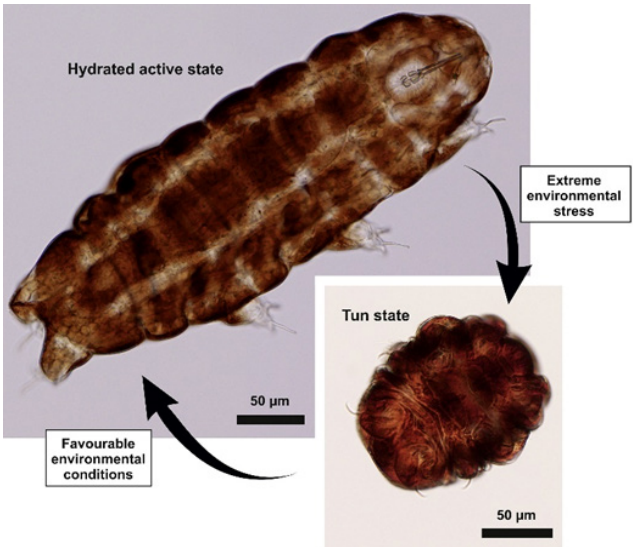

2019 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইজরায়েলের চন্দ্রযান (lunar lander) 'বেরেশিট' (Beresheet) চাঁদের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল যার মধ্যে বিশেষ প্রকোষ্ঠে কয়েক হাজার টারডিগ্রেড সুপ্ত অবস্থায় রাখা ছিল । কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে 'বেরেশিট' চাঁদের মাটিতে ভেঙে পড়ে । কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন 'বেরেশিট' ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময় যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়েছিল পৃথিবী থেকে পাঠানো টারডিগ্রেডরা তা সহ্য করে চাঁদের মাটিতে বেঁচে আছে।

2017 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার হারভার্ড ইউনিভার্সিটি ও বৃটেনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা একসাথে গবেষণা করে বলেছেন যে বিভিন্ন বিধ্বংসী মহাজাগতিক ঘটনা (cataclysmic cosmic events) যেমন কোন ধুমকেতু বা গ্রহাণুর সাথে সংঘর্ষ, পৃথিবীর কাছাকাছি কোন সুপারনোভার (supernova) বিস্ফোরণ, বা অত্যন্ত ক্ষতিকারক গামা রশ্মি (gamma ray) বিকিরণের মত মহাজাগতিক বিপর্যয়ের ফলে আগামী কয়েকশো কোটি বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে মানবজাতি সহ প্রায় পুরো জীবগোষ্ঠী বিনষ্ট হয়ে গেলেও ছোট্ট টারডিগ্রেডরা সম্ভবত এই সমস্ত মহাজাগতিক বিপর্যয় উপেক্ষা করে সফলভাবে বেঁচে থাকবে। ●

লেখক ***ডঃ সৌরভ সোম*** *কলকতার ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এবং লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখক।*
ইমেল: sauravshome48@gmail.

পদার্থবিজ্ঞানীরা পরিমাপ করতে সক্ষম হলেন জটিল কোয়ান্টাম এন্টাঙ্গেলমেন্ট স্টেট

শামীম হক মণ্ডল

'ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং এবং ইলেকট্রিক সার্কিটে এনার্জি কোয়ান্টাইজেশন' সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তিন মার্কিন বিজ্ঞানীকে এবছর পুরস্কৃত করে নোবেল কমিটি। আপাত দৃষ্টিতে যেসব ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না, ইলেকট্রন, প্রোটনের দুনিয়ায় সেগুলিই বাস্তব! এবার তো তিন পদার্থবিজ্ঞানী, ক্লার্ক, মার্টিন ও ডেভোরে দেখিয়েছেন মাইক্রোস্কোপিক জগতের সেই নিয়মে আমাদের চেনা ম্যাক্রোস্কোপিক জগতেও ক্ষেত্রবিশেষ খাটে। আসলে কোয়ান্টামের জগৎ বড়ই অদ্ভুত। আর এই মায়াবি জগতের এক মজার ব্যাপার হলো এন্টাঙ্গেলমেন্ট। কি সেটি?

আগে একটা গল্প বলি। ধরুন আপনার একটা বন্ধু আছে, যে আপনার থেকে অনেক দূরে থাকে। এখন আপনার কাছে আমরা (বাইরের কিছু লোকজন) কিছু গোপন তথ্য জানতে চাইলাম, সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সেই বন্ধু খবর পেয়ে যাবে; আপনি কিন্তু তাকে ফোন করেননি বা নিজে থেকে কোনো যোগাযোগ করেননি। কি আজগুবি মনে হচ্ছে না! ঠিক তেমনি মাইক্রোস্কোপিক জগতের দুটি ফোটন বা ইলেকট্রন একে অপরের সাথে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে যে, একটি অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলে, সাথে সাথেই অন্যটির অবস্থাও বদলে যাবে। এমনকি কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও তারা পরস্পরের সাথে এক অদৃশ্য বন্ধনে জড়িয়ে থাকে, একে বিজ্ঞানীরা বলেন কোয়ান্টাম এন্টাঙ্গেলমেন্ট। আইনস্টাইন যদিও একে বলেছিলেন "spooky action at a distance", কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণাদের ক্রিয়াশীল এই রহস্যময় সংযোগের ওপরেই কোয়ান্টাম কম্পিউটার, কোয়ান্টাম যোগাযোগ ব্যবস্থা, এমনকি আধুনিক কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে।

সমস্যা হচ্ছে, এই কোয়ান্টাম এনট্যাংগলমেন্ট অবস্থা পরিমাপ করা বা নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন। সম্প্রতি জাপানের কিয়োটো এবং হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পদার্থবিজ্ঞানী, সর্বপ্রথম W স্টেট নামের এক বিশেষ ধরণের কোয়ান্টাম এনট্যাংগলমেন্ট অবস্থা মাপতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের এই কাজ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সায়েন্স অ্যাডভান্স নামক বিখ্যাত জার্নালে।

মাইক্রোস্কোপিক জগতের এনট্যাংগলমেন্ট অবস্থা মাপতে পদার্থবিজ্ঞানীরা সাধারণত কোয়ান্টাম টোমোগ্রাফি নামে পরিচিত একটি কৌশল ব্যবহার করেন। সেক্ষেত্রে একটি কণার অনেক অভিন্ন অনুলিপি তৈরি করা হয়, যাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কোণে পরিমাপ করা হয়। তারপর একটি পূর্ণ কোয়ান্টাম অবস্থা পুনর্গঠনের জন্য এইসব পরিমাপের ফলাফলগুলি একত্রিত করা হয়। ব্যাপারটা ভালো ভাবে বোঝার জন্য যে কোনো কনফারেন্সে যে গ্রুপ ফোটো তোলা হয় তার সাথে তুলনা করতে পারি। একটি গ্রুপ ছবি তোলার পরিবর্তে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যের আলাদা করে ছবি তুলে একটা ফ্রেমে বসাতে

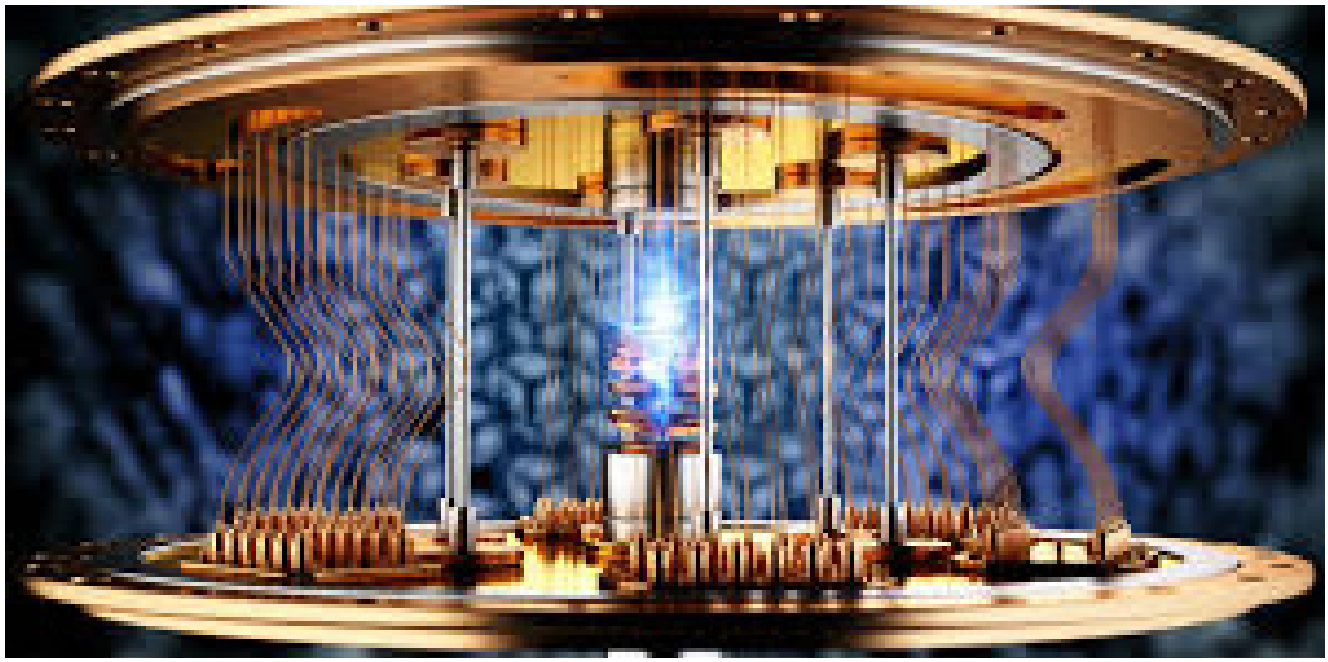

পারি। একটা কনফারেন্সের পূর্ণাঙ্গ ছবি মানে কি—তাতে প্রতিটি সদস্যের ছবি থাকবে। কোয়ান্টাম এন্টাঙ্গেলমেন্ট পরিমাপে সেই কাজটাই করা হয়।

বিভিন্ন কোয়ান্টাম এন্টাঙ্গেলমেন্ট অবস্থার মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হলো দুটি: গ্রিনবার্গার-হর্ন-জেইলিঙ্গার (GHZ) স্টেট, ও W স্টেট। GHZ অবস্থায় একবার কোনো কিউবিটের পরিমাপ করলে এন্টাঙ্গেলমেন্ট নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ একটির পরিমাপ করলে সিস্টেমের বাকি কণারা স্বাধীন হয়ে যায়। অপরদিকে, W স্টেট তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি "সহনশীল"; এই অবস্থায় একটি কণা মেপে ফেললেও এন্টাঙ্গেলমেন্ট কিছুটা টিকে থাকে। সেজন্য পদার্থবিদরা W স্টেটের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী, কারণ এরা শক্তিশালী কোয়ান্টাম বন্ধন প্রদর্শন করে, যার কোনো এক প্রান্ত ছিঁড়লেও বাকিটা অক্ষত থাকে।

এখনও পর্যন্ত, তিন কণা বিশিষ্ট কোয়ান্টাম সিস্টেমের জন্য, এন্টাঙ্গেলমেন্ট পরিমাপ শুধুমাত্র GHZ স্টেটের উপর করা হয়েছে, যেখানে সমস্ত কিউবিট (কোয়ান্টাম বিট) হয় 1 স্টেটে বা 0 স্টেটে থাকে। এতদিন কোনো গবেষক দল W স্টেটের মতো জটিল অবস্থার এন্টাঙ্গেলমেন্ট পরিমাপ করেননি; টাকিউচি ও তাঁর সহকারীরা সর্বপ্রথম তিনটি ফোটন (যাদের সমাবর্তন দশা এক একটি কিউবিটের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়) সম্বলিত সরলতম W স্টেটের এন্টাঙ্গেলমেন্ট পরিমাপ করেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে আমরা সচারাচর যে কম্পিউটার ব্যবহার করি তা কাজ করে 'বিট' আদান প্রদানের মাধ্যমে। এই 'বিট' হয় 0 বা 1 হতে পারে। 1 মানে হ্যাঁ সূচক নির্দেশ আমরা কম্পিউটারকে দিচ্ছি, আর 0 মানে না সূচক। হয় 'হ্যাঁ', নয় 'না', যেকোনো একটি ভাষা বোঝে আমাদের পরিচিত ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার। ওদিকে কোয়ান্টাম কম্পিউটার কাজ করে কোয়ান্টাম বিট বা 'কিউবিটের' মাধ্যমে। সুপারপজিশন প্রিন্সিপালের জন্য এই কিউবিট একই সাথে 0 ও 1 দুটোই হতে পারে।

দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছিলেন এই W স্টেটকে অন্তত একবার পরিমাপ করতে। এতদিন পর্যন্ত সেটি অসম্ভবই মনে করা হতো, কারণ এই অবস্থায় তিন বা তার চেয়েও বেশি ফোটনকে এনটাঙ্গেলড বা জড়িয়ে রাখার দরকার পড়ে; এবং সেই অবস্থায় একসাথে তাদেরকে পরিমাপ করা ছিল কল্পনাতীত।

কিন্তু এবার জাপানি গবেষকেরা সেই অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনটি ফোটনের সমন্বয়ে তৈরি একটি W স্টেটকে তাঁরা একটি অপটিক্যাল সার্কিটের বা বিচ্ছিন্ন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম (DFT) সার্কিটের মাধ্যমে সেটিকে এমনভাবে পাঠায়, যাতে তিনটি কণার একসঙ্গে এনটাঙ্গেলড অবস্থায় পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ, একটি সমন্বিত এনট্যাংগল্ড পরিমাপের মাধ্যমেই পুরো অবস্থাটিকে একবারেই জানা সম্ভব হলো। এই কাজে তাঁরা W স্টেটের এক বিশেষ ধর্মকে কাজে লাগায়: আলাদা আলাদা W স্টেট গুলি দেখতে একইরকম, শুধু সামান্য দশা বদলালেই স্টেট গুলি বদলে যায়।

তাঁদের এই সাফল্যের ফলে কোয়ান্টাম তথ্যবিজ্ঞানের এক বিশাল দ্বার উন্মোচিত হল। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে, ফোটনগুলোর এনট্যাংগলমেন্ট অবস্থার ওপর নির্ভর করে তৈরি হবে আধুনিক ও সুরক্ষিত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এক শতাব্দী আগে আইনস্টাইন, বোর, হাইজেনবার্গ যে মায়াবি কোয়ান্টাম জগতের কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন, আজ তা চলে এসেছে পরীক্ষাগারে, মানুষের হাতের নাগালে। ●

লেখক ***ডঃ শামীম হক মন্ডল*** *রাজ্য ফরেনসিক বিজ্ঞান গবেষণাগারের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত এবং একজন জনপ্রিয় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখক। ইমেল: shamimmondal709@gmail.com*

এক উজ্জ্বল শিকারির কথা

দীপ্তরূপ মল্লিক

শিকারি আবার উজ্জ্বল, তা হয় নাকি? হ্যাঁ, হয় বইকি। জীবের দীর্ঘ বিবর্তনে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের এক অন্যতম প্রধান চালিকশক্তি হল তার শিকারীসত্তা। কোনো প্রাণী তার থেকে ছোট বা বড় প্রাণীকে শিকার করতে পারে আবার কিছু বিশেষ গোত্রের উদ্ভিদও (যেমন, কলসপত্রী) শিকারে পারদর্শী হয়। শিকার–শিকারির সম্পর্ক তাই সার্বজনীন, ঘটমান এক চিরসত্য। স্থলজ বা জলজ বাস্তুতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিটি প্রাণীই নির্দিষ্ট পরিবেশে খাপ খাইয়ে সেখানে উপলব্ধ প্রাণীদের সাথে অন্যান্য আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি এই সম্পর্কটিও স্থাপন করে। এবার আসি শিকার ধরার কৌশলের কথায়, স্থলভূমিতে শিকারি যে উপায়ে শিকারের ওপর আক্রমণ করে, জলে তা সম্ভব নয়; স্থলপ্রাণীদের শিকার কৌশল মোটামুটি সকলেরই অল্পবিস্তর জানা, কিন্তু জল বিশেষ করে গভীর সমুদ্রে থাকা প্রাণীদের নামও যেমন অল্পশ্রুত, শিকার কৌশল তো আরওই অজানা। তেমনি এক অচেনা শিকারির স্বল্প পরিচিতি রইল আজকের পাতায়।

ডোরাকাটা বা স্ট্রাইপড মার্লিন, গভীর সমুদ্রের এক অন্যতম প্রধান শিকারি মাছ। এরা সাধারণত দলবদ্ধভাবে শিকার করতে পছন্দ করে। এক-একটি মার্লিনের দল থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য মাছের দলের ওপর আক্রমণ করা, তাদেরকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। কারেন্ট বায়োলজি পত্রিকার একটি নতুন গবেষণায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে তারা কীভাবে তাদের শিকারের উপর আক্রমণের এই কৌশলকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সমন্বয় করতে পারে যাতে একে অপরকে কোনোভাবে আঘাত না করে ফেলে। এই কৌশলটির পিছনে রয়েছে তাদের দ্রুত বর্ণ পরিবর্তন করার ক্ষমতা।

গবেষকরা ড্রোন ব্যবহার করে দেখেছেন যে মার্লিন যখন আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে তখন তারা 'আলোকিত' হয়ে যায় এবং সরাসরি আক্রমণের মুহূর্তে তারা অন্যদের তুলনায় আরও অনেক বেশি 'উজ্জ্বল' হয়ে ওঠে , কিন্তু পরমুহূর্তেই দ্রুত উজ্জ্বলতা কমিয়ে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। দেহ জুড়ে থাকা সুবিন্যস্ত ডোরাগুলির উজ্জ্বলতার কারণেই মাছগুলিকে এত উজ্জ্বল দেখায়, পরে সাঁতার কেটে চলে যাওয়ার সময় ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। বর্ণ পরিবর্তনের এই কৌশল এমনকি তাদের শিকারকে বিভ্রান্ত করার দ্বৈত উদ্দেশ্যও পূরণ করতে পারে।

এই রঙের পরিবর্তন একজন মানুষের কাছে আক্রমণের জন্য এক প্রেরণাদায়ক নির্ভরযোগ্য সংকেত হিসাবে পরিগণিত হতেই পারে। এটা এখন সর্বজনবিদিত যে মার্লিন রঙ পরিবর্তন করতে পারে, তবে, বিশেষ উল্লেখ্য, এই ধরনের আচরণকে খুব সুচারুভাবে এবং অবশ্যই সর্বপ্রথম মানুষের শিকারধর্ম বা কোনও সামাজিক আচরণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এই আবিষ্কার থেকে বোঝা যায় যে মার্লিনের আন্তঃযোগাযোগ স্থাপনের সূত্রগুলি ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি জটিল, সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী। আলো-আঁধারির এই পর্যায়ক্রমিকতায় মার্লিনের দেহ জুড়ে চলতে থাকে অজস্র রাসায়নিক বিক্রিয়া, যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় জৈবপ্রভার বিক্রিয়াসমূহ (reactions of bioluminescence)। তার বেশ কয়েকটি জানা গেলেও পুরোপুরি জানা যায়নি। বিজ্ঞানীদের কৌতূহল বর্তমানে রয়েছে তারা একা শিকারের সময় আদৌ রঙ পরিবর্তন করে কিনা, যদি করে, তবে তা তাদের শিকারকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং আরও অনেক কিছু। এই উজ্জ্বল শিকারিকে নিয়ে গবেষণার যাত্রাটি আরও উজ্জ্বল হোক...

*লেখক **শ্রী দীপ্তরূপ মল্লিক** একজন বিজ্ঞান লেখক, প্রকৃতিপ্রেমী এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ একাডেমিক এন্ড সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট-এর সক্রিয় সদস্য। ইমেল: diptarupmallick3@gmail.com*

এক তরুণ বিজ্ঞান প্রতিভার অপমৃত্যু

অসিত চক্রবর্তী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে নাৎসী জার্মানির অত্যাচার থেকে নিজেদের ও তাঁদের পরিবার বাঁচাতে অথবা ইহুদি ও শত্রু দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের উপর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদের কারণে বিপুল সংখ্যক প্রতিভাধর বিজ্ঞানী তদানীন্তন বিজ্ঞানের জ্ঞানপীঠ জার্মানি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই তালিকায় রয়েছেন সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সহ জিলার্ড (L Szilard; 1898–1964), টেলার (E Teller; 1908–2003), উইগনার (E Wigner; 1902–95), মেইটনারের (L Meitner; 1878–1968) মতো অন্য দেশীয় বা অখ্রিশ্চান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ। এমনকি স্বদেশ ছাড়তে হয়েছিল বেথে (H Bethe; 1906–2005), ডেলব্রুক (L Delbruck; 1906–81), হার্জবার্গ (G Herzberg; 1904–99), প্রমুখের মতো জার্মান বংশোদ্ভূত অনেক বিজ্ঞানীকেও। স্বস্তির ঘটনা হ'ল, এঁরা প্রায় সবাই অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার পরে তাঁদের গবেষণার কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাদের পারিবারিক জীবনও কিছুটা ছন্দে ফিরেছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এইসব কৃতী বিজ্ঞানীদের পাশে ইতিহাসে কিছুটা উপেক্ষিত এমন অন্তত একজন অসীম প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর কথা আমরা জানতে পারছি যিনি নাৎসী জার্মানি ত্যাগ করে নিজের পছন্দের দেশে নাগরিকত্ব নেবার পরে দ্বিতীয় দেশের বিষ নজরে পড়েন ও মাত্র পঁত্রিশ বছর বয়সে সেই দেশে মৃত্যুর যূপকাষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হন। হতভাগ্য এই বিজ্ঞানীর নাম হ্যান্স গুস্তভ অ্যাডল্ফ হ্যালমেন (H Hellmann; 1903–38)।

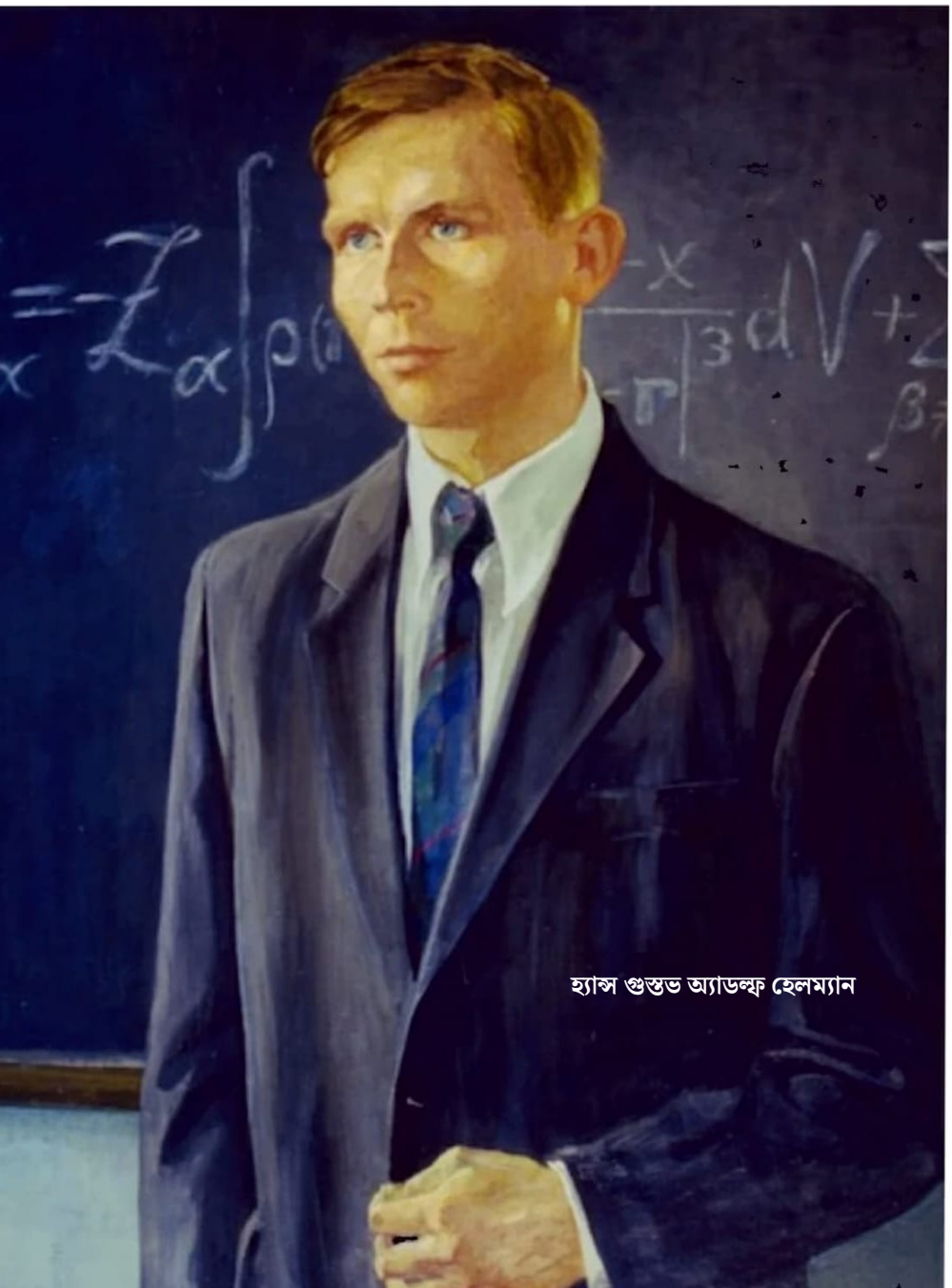

হ্যান্স গুস্তভ অ্যাডল্ফ হেলম্যান

জার্মানির উইলহেল্মশেভেন বন্দর শহরে 1903 সালের 14ই অক্টোবর এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। দুর্ঘটনায় বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পরে তাঁর সামান্য পেনশনের টাকা ভরসা করে ও কঠোর পরিশ্রমে মা শিশু হেলম্যানকে উচ্চতর স্কুলের গণ্ডি পার করান। এই পরিস্থিতিতে বালক হেলম্যানকে অনেক সময় ভ্রমণ পরিদর্শক হিসেবে অর্থ উপার্জন করতে হয়। স্টুটগার্টের ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে প্রথমে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও অব্যবহিত পরে বিষয় পরিবর্তন করে পদার্থবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হন। এই সময়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মশালা ও গবেষণাগারে অতিরিক্ত সাহায্যের কাজ করে নিজের খরচ চালাতেন। স্টুটগার্টে পড়ার মাঝে তিনি কয়েক মাসের ছুটি নেন ও কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাহনের (Karl Zahn; 1865–1940) গবেষণাগারে ভৌত রসায়ন বিভাগে এক ছাত্র সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। সেখানেই তিনি যোজ্যতা বিষয়ক ইলেকট্রন তত্ত্বের সাথে পরিচিত হন। স্টুটগার্টে ফিরে অধ্যাপক রিজেনার (E Regener; 1881–1955), ফুস (E Fues; 1893–1970), প্রমুখের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা শুরু করেন এবং

এরিক রিজেনার

হ্যানোভার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

অণু ও কেলাসের উপর সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ সম্পর্কে উৎসাহী হন। ওখানে ছাত্রাবস্থায় অটো হান (Otto Hahn; 1879–1968) এবং মেইটনারের বার্লিনের তেজস্ক্রিয়তা বিষয়ক গবেষণাগারে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ নেন। অবশেষে স্টুটগার্ট ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক হন।

অধ্যাপক রিজেনার তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সাথে বন্ধুবৎসল আচরণ করতেন ও মাঝেমধ্যে তাদের তাঁর নিজের বাড়িতে ডাকতেন। ওখানেই হেলম্যান পরিচিত হন রিজেনারের পালিত কন্যা তথা তাঁর স্ত্রীর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া ভিক্টোরিয়া বার্নস্টাইনের সাথে। বার্নস্টাইন আসলে ছিলেন ইহুদি এবং একসময় বাবা মায়ের সাথে ইউক্রেনে থাকতেন। তাঁদের মৃত্যুর পরে ভিক্টোরিয়া, রিজেনারের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে হেলম্যান ও বার্নস্টাইন প্রথমে প্রেম ও পরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। স্নাতকোত্তর পর্বে অধ্যাপক ফিউসের সহযোগিতায় হেলম্যান হ্যানোভার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (TH) এক সহকারীর চাকরি পান ও কোয়ান্টাম রসায়ন বিজ্ঞানী হিসেবে গবেষণা শুরু করেন। 1931 সালে ঐ ইনস্টিটিউটে লেকচারার পদে বিবেচিত হন। সেখানে তাঁর বাম মনোভাবাপন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাবনার জন্য ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা মাঝেমধ্যেই অপমানিত হতেন। এসবের মধ্যে 1933 সালে হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর পদে নির্বাচিত হন। নতুন সরকারের SA এবং SS বাহিনী বিভিন্ন ধারায় জার্মান ইহুদি ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গের উপর অন্যায় অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। এরকম এক ঘটনা সরাসরি প্রত্যক্ষ করে হেলম্যান ভয়ে তাঁর বাড়িতে ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বই ও পত্র ও পত্রিকা, যেগুলো জার্মানিতে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল, পুড়িয়ে ফেলেন। হেলম্যান তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা পত্র জমা দিতে গেলে তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্মসূত্রে ইহুদি পরিচয় জানাতে বাধ্য হন। 1933 সালের 24শে ডিসেম্বর তাঁকে নোটিশ দেয়া হয় যেন 1934 সালের 31শে মার্চের মধ্যে পরিবারসহ তিনি জার্মানি ত্যাগ করেন।

চারদিকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে এবং একের পর এক বিজ্ঞানীর জার্মানি ত্যাগ করার পরিপ্রেক্ষিতে হেলম্যানের কাছে এই নোটিশ অপ্রত্যাশিত ছিল না। তার উপর ছিল তাঁর স্ত্রীর ইহুদি পরিচয়। ততদিনে তিনি কাজের সূত্রে উন্নত দেশগুলোতে পরিচিত। কিছু সূত্রে পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী তিনি ব্রিটেনেও সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর আদি নিবাস ইউক্রেন হবার দরুন ও নিজে সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও ধারণায় বিশ্বাসী বলে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন প্রতিষ্ঠানে সুযোগ খুঁজছিলেন। স্টুটগার্টে কর্মরত বিজ্ঞানী ভাইজকফের (V Weisskopf; 1908–2002) সাহায্যে 1931 সালে ইউক্রেনের খারকভের ফিজিকাল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ও দনিপ্রোপেট্রোভস্ক শহরের একটা নামী গবেষণা সংস্থায় আমন্ত্রণ পত্র পান। কিন্তু দু'ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁকে ভিসা দিতে অসম্মত হয়। 1932 সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী রুমেরের (Y Rumer; 1901–85) সুপারিশে মস্কোর বিখ্যাত কারপভ ইনস্টিটিউটে আমন্ত্রণ পান এবং পরে রুমেরের সাহায্যেই হেলম্যান সোভিয়েত ভিসা পান। 1934 সালের এপ্রিলের শেষে মস্কোতে পৌঁছে মে মাসে ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন।

হেলম্যান, 1930

কারপভ ইনস্টিটিউটে মাত্র চার বছর কাজের সময়ের পরিধিতে তিনি বহু ছাত্র ছাত্রীর গবেষণায় সাহায্য করেন। ওখানে থাকার সময় তিনি প্রথম কয়েক বছর অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতো প্রচুর সম্মান পান। তাঁকে নিজস্ব আবাসন ও নিত্যকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেয়া হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগের মাধ্যমে বোর (N Bohr; 1885–1962), ডিরাক (1902–84), পেরিনের (J Perrin; 1870–1942) মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। পরিচিত সকলের অনুরোধে 1935 সালে সোভিয়েত দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সেবছর তিনি সোভিয়েত দেশে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। প্রথম দুবছরের মধ্যে তাঁর বেতন দ্বিগুণ হয়। 1937 সালে তিনি প্রফেসর হন ও একজন 'অগ্রণী বিজ্ঞানী' হিসেবে ঘোষিত হন।

1933 সালে যখন হেলম্যান জার্মানিতে ছিলেন তখন থেকেই তিনি তাঁর গবেষণার সমস্ত কাজ জড়ো করে জার্মান ভাষায় একটা বই লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ সম্পর্কে ওখানে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন। মস্কোতে আসবার পরে তিনি পরবর্তীকালের অন্য গবেষণার কাজ একত্রিত করে তাঁর উপযুক্ত তিন ছাত্রের সাহায্য নিয়ে রাশিয়ান ভাষায় সেই বই লেখার কাজ শেষ করেন। নাম রাখেন Quantum Chemistry, যার মুদ্রিত সব কপি খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। একইসাথে জার্মানীর একজন পুরোনো সহকর্মীর সহায়তায় জার্মান ভাষায় ঐ বই প্রকাশ করেন। কিন্তু দুঃখের কথা, ঐ বই প্রকাশের পরে কোন অজ্ঞাত কারণে দু'দেশেই ঐ বই ও লেখকের পরিচয় অদৃশ্য হয়ে যায়। এমনকি পরবর্তীতে মস্কোতে তাঁর সহযোগী অধ্যাপক সিরকিনের (Y Syrkin; 1894–1974) লেখা বইতেও হেলম্যানের কোন কাজের পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য হেলম্যানের ঐ বইয়ের একটা কপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গোপনে পাচার হয়ে যায়। 1944 সালে ঐ কপি উদ্ধার হয়। মাত্র সাত বছর সময়কালে হেলম্যানের কাজের সূক্ষ্মতা ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে নোবেলজয়ী রসায়ন বিজ্ঞানী হফম্যানের (Roald Hoffmann; 1937–) উক্তি, '....সেই সময়ের নিক্তিতে তাঁর বই যথেষ্ট প্রগতিশীল'। তিনি হেলম্যানকে 'সত্যিকারের অসামান্য একজন বিজ্ঞানী' মর্যাদায় অভিহিত করেছেন। বস্তুর গঠন, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, রাসায়নিক বন্ধন, বিজ্ঞানের দর্শন, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বেশ কিছু জনপ্রিয় প্রবন্ধও লিখেছেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্বকে সোভিয়েত দেশে যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখা হত। ওখানকার অনেকের মতে তা' ছিল মার্ক্সীয় ধারণার পরিপন্থী। অথচ হেলম্যানের বেশির ভাগ কাজ ছিল কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উপর নির্ভরশীল। হয়তো বা প্রশাসনের ক্রূর দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে অনিশ্চয়তা তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁকে একটা মধ্যপন্থা

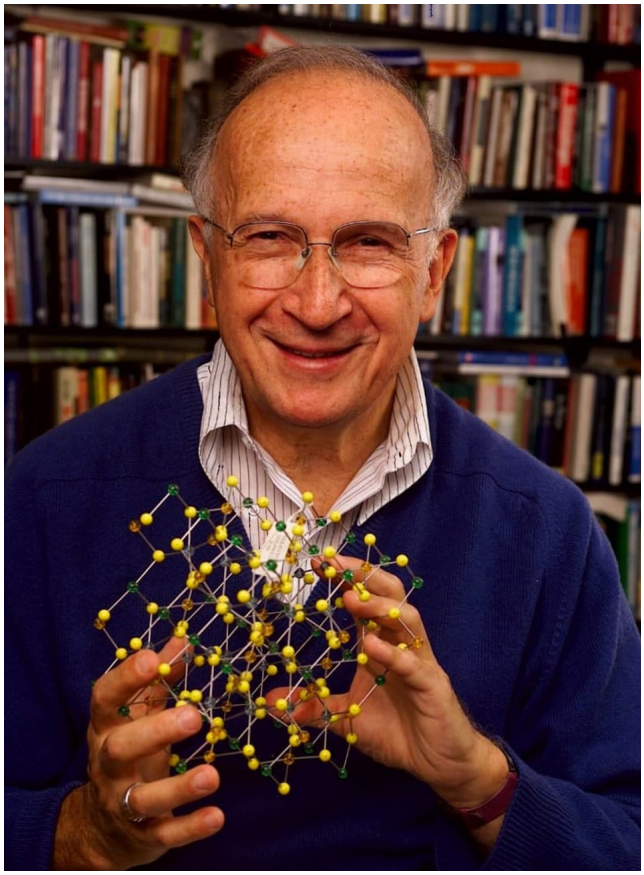

রোয়াল্ড হফম্যান

রিচার্ড ফাইনম্যান

নিতে হয়েছে। তিনি লিখেছেন, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্বের মাধ্যমে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেন প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণা নীতিগতভাবে সীমাবদ্ধ। বাস্তবে তা' নয়। ..... (এটা) বরং বস্তুর ধর্ম সম্পর্কিত উপলব্ধিকে সীমাবদ্ধ করে। এই উপলব্ধি হ'ল দৃশ্যমান জগতে হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত পূর্ব নির্ধারিত উপলব্ধি, যেটা সনাতনী বলবিদ্যার সহায়তায় অন্তিম এবং স্বচ্ছ অবয়ব ধারণ করেছে'। বিজ্ঞানী হেলম্যান নিজে এটা কতটুকু বিশ্বাস করতেন তা' জানা নেই।

স্তালিন জমানার লাল অত্যাচার বিদেশীদের, বিশেষত জার্মানদের, উপর ক্রমশ বাড়ছিল। কারপোভ ইনস্টিটিউটে অনেক সতীর্থের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে হেলম্যানের মতানৈক্য হচ্ছিল। হ'তে পারে, সোভিয়েতে একজন জার্মান বিজ্ঞানীর দ্রুত উত্থানের কারণে অনেকেই ঈর্ষান্বিত ছিল। তখন গড়ে প্রতি দু'মাসে তাঁর একটা করে গবেষণা পত্র প্রকাশিত হচ্ছিল। গবেষণার মাত্র সাত বছরের জীবনে তার গবেষণা পত্রের সংখ্যা ছিল চল্লিশের বেশি। তার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক প্রকাশিত হয়েছিল তখনকার বিভিন্ন বিখ্যাত গবেষণা পত্রিকায়। এখনো প্রাসঙ্গিক হেলম্যানের এমন কতকগুলো উল্লেখযোগ্য কাজ হল বস্তুর পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের মানের উপর রেডিও তরঙ্গর কম্পাঙ্কের প্রভাব, বায়ুমন্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোনের আয়নীভবন, অণু ও পরমাণুর ঘূর্ণন, অণুর আভ্যন্তরীন শক্তি ও বল সংক্রান্ত ভিরিয়াল ও হেলম্যান-ফাইনম্যান তত্ত্ব, যোজ্যতা ইলেকট্রন ও ভিতরের নিউক্লিয়াস সহ আভ্যন্তরীন ইলেকট্রনের পারস্পরিক ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সিউডোপোটেনশিয়ালের (pseudopotential) ধারণা, ইত্যাদি। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় একটা তত্ত্বের উদ্ভাবক হিসেবে তাঁর নাম যুক্ত নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ফাইনম্যানের (R Feynman; 1918–88) সাথে।

ইনস্টিটিউটের রাজনীতির নোংরা পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে তিনি মস্কোর একাডেমি অব সায়েন্সেসে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাশিয়ান ভাষায় তাঁর তেমন ব্যুৎপত্তি না থাকায় তা সম্ভব হয়নি। এমনি অবস্থায় কোন অজ্ঞাত কারণে 1938 সালের মার্চ মাসে হঠাৎ ইনস্টিটিউট থেকে হেলম্যান সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যান। অবশ্য তাঁর স্ত্রী ও আট বছরের সন্তানের কাছে সামান্য অতিরিক্ত তথ্য ছিল। তা হল, 9 এবং 10 ই মার্চের সংযোজী রাতে হঠাৎ কালো পোশাকে ঢাকা একদল লোক তাঁদের বাড়িতে ঢুকে বিভিন্ন বই, পত্র পত্রিকা ঘাঁটতে থাকে ও পরে হেলম্যানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কোন খবর বা কারণ জানতে না পেরে তাঁর স্ত্রী কয়েকদিন পরে হেলম্যানের পাওনা টাকা নিতে ইনস্টিটিউটে যান। সেখানেই তিনি দেখতে পান দেয়ালে সাঁটানো এক বুলেটিন। এতে হেলম্যান সম্পর্কিত অনেক অভিযোগ লেখা ছিল। নীচে তাঁর ইনস্টিটিউটেরই দুই সতীর্থের স্বাক্ষর ছিল যাঁরা সোভিয়েত গোপন বাহিনীর সাথে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। হেলম্যানের অবর্তমানে পরবর্তীকালে এঁদের অন্তত একজনের ইনস্টিটিউটে

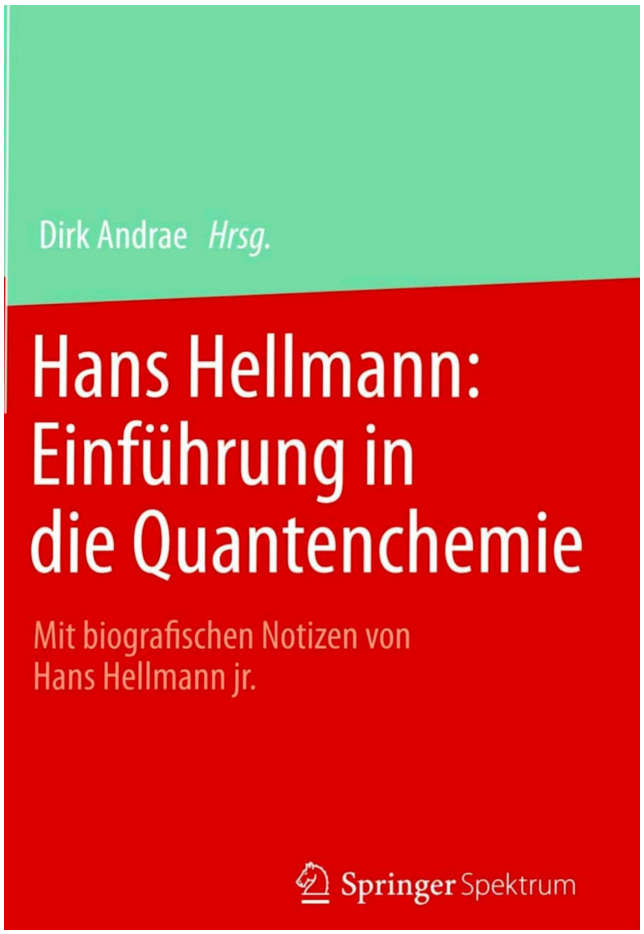

প্রতিপত্তি ও হেলম্যানের ছাত্রছাত্রীসহ তাঁর গবেষণাগারে প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বলাই বাহুল্য, ইনস্টিটিউটে গিয়ে হেলম্যানের স্ত্রী কিন্তু কোন বকেয়া অর্থ পাননি।

হেলম্যান গ্রেফতার হবার পরে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের তাঁদের আবাসন থেকে বিতারণ করা হয়। পরের তিন বছর স্ত্রী একটা স্কুলে কাজ করার সুযোগ পান। 1941 সালে স্ত্রীকেও গ্রেফতার করে প্রথমে মস্কোর একটা জেলে বন্দী করে রাখা হয় ও পরে কাজাখাস্তানের এক আশ্রয়স্থলে পাঠানো হয়। ছেলের স্থান হয় এক শিশু আবাসে। অবশ্য জুনিয়র হেলম্যান ওখান থেকে পালিয়ে তার আত্মীয়দের মাঝে জিনাডিজ মিঞ্চিন ছদ্ম নামে লুকিয়ে থাকেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে 1991 সালে ছেলে জার্মানিতে যাওয়ার ছাড়পত্র ও আসল নাম ব্যবহারের সুযোগ পান। মায়ের গ্রেফতারের পনের বছর পরে 1956 সালে মা ও ছেলের একবার দেখা হয়। আর বিশদে তাঁরা হেলম্যানের অন্তিম করুণ পরিণতির কথা জানতে পারেন 1989 সালে। NKVD বা People's Commissariat for Internal Affairs -এর নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, 9ই মার্চ বাড়ি থেকে গ্রেফতারের পর হেলম্যানকে মস্কোর তাকাঙ্কা কারাগারে পাঠানো হয়। 17ই মে তাঁর জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি ঘোষণা করা হয় এবং 29শে মে গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়। নথিতে আরো জানা যায়, তাঁর অন্যায়ের জন্য কোন বিচার সভা বসেনি, শুধুমাত্র কিছু প্রশ্নোত্তর ছাড়া। আর পাওয়া যায় অন্যের হাতে লেখা একটা স্বীকারোক্তি যেখানে হেলম্যান স্বীকার করেন যে তিনি নাৎসী জার্মানির গুপ্তচর হয়ে কারপভ ইনস্টিটিউটে যোগ দেন যাতে বিষাক্ত গ্যাস প্রস্তুতি এবং এমন সব গোপন তথ্য তিনি জার্মানিতে পাঠাতে পারেন। নীচে কাঁপা হাতে রয়েছে তাঁর স্বাক্ষর। স্তালিনের সন্ত্রাস বাহিনীর একজন প্রধান ভায়াচেশ্লাভ মলোটভ 1960 সালে এক কথোপকথন কালে 1937 সালের সোভিয়েত দেশে অত্যাচার সম্পর্কে বর্ণনা দেন, '(সোভিয়েত ইউনিয়ন) পরিশুদ্ধ করার জন্য 1937 সালকে আমাদের ধন্যবাদ জানাতে হবে। সবচেয়ে জরুরী ছিল এটা দেখা যেন কোন শত্রু বাদ না যায়, নির্দোষ কারো শাস্তি ছিল গৌণ বিষয়'। 1937 সালে ভীত সন্ত্রস্ত হেলম্যান তাঁর এক জার্মান আত্মীয়কে চিঠিতে জানান, 'বিদেশিরা (এখানে) ভালো নেই, তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে'। বিশদে কিছু লেখেননি। 1938 সালের নববর্ষে মাকে লিখেছেন,' ... আমি তোমাকে আরো ঘন ঘন চিঠি লিখিনা, এর অর্থ অবশ্যই আমার তরফে তোমার প্রতি অবহেলা নয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার ধারণা আছে। যুদ্ধ পূর্ববর্তী অবস্থা চলছে। সুতরাং অন্য দেশের সাথে বেশি তথ্য আদান প্রদানের ব্যাপারে আমি খুব ভীত। সত্যি বলতে, আমাদের মধ্যেকার দেয়াল আরো উঁচু হচ্ছে'। 1938 সালে আইনস্টাইন স্বয়ং স্তালিনকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখে আশা প্রকাশ করেন 'যেন বিরল প্রতিভার ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রতি কার্যক্রমে বিশেষ যত্ন নেয়া হয়'। জানার উপায় নেই, সেই চিঠি স্তালিনের হাতে যথাসময়ে পৌঁছেছিল কিনা।

হেলম্যান তথা বিজ্ঞান ইতিহাসের দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়। পরবর্তীকালে প্রকাশিত 1944 সালের জার্মান কমিশনের এক গোপন তদন্ত রিপোর্টে সোভিয়েতে বসবাসকারীদের মধ্যে 'কাঙ্ক্ষিত (wanted) অপরাধী'দের তালিকায় তাঁর নাম দেখা যায়। অর্থাৎ, জার্মান নাৎসী বাহিনীর এক বিশেষ লক্ষ্য ছিলেন তিনি। জানা নেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে এমন দুর্ভাগ্যের শিকার কতজন হয়েছিলেন। জার্মানি থেকে হেলম্যান বিতাড়িত হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ইহুদি বংশোদ্ভুত বলে। আর প্রাণ রক্ষার্থে সোভিয়েত দেশে গিয়ে সেখানে মৃত্যুর শিকার হন জার্মান বলে। অথচ এই দুই প্রশাসনের অন্তত সোচ্চার বিরোধী উনি বা তাঁর পরিবার ছিলেন না। চৌত্রিশ বছরের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনে শুধুমাত্র চেয়েছিলেন পরিবারের সাথে শান্তিতে থেকে নিজে গবেষণার কাজে নিয়োজিত থাকতে। ●

তথ্যসূত্র

1. Hans G A Hellmann (1903-1938), Schwarz et al, Translated from Bunsen Magazine, 1999
2. The Tragic History of Hans Hellmann; Andrew Grant

লেখক ***ড. অসিত চক্রবর্তী*** *চাকদহ কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিজ্ঞান লেখক।*
ইমেল: chakrabarti.asit0@gmail.com

তালচটকদের কথা

অমর কুমার নায়ক

বিভিন্ন ধরণের পাখির বাস আমাদের ঘিরে। কত রকম তাদের। কারো ডানার পালকে বর্ণের ছটা তো কেউ বা ছোটে দেখার মত গতিতে। আবার কোনও পাখি আকাশ চিরে চক্কর কাটে তীর বেগে। নানা জায়গায় পাখি দেখতে গিয়ে অনেক নতুন পাখির সাথে আলাপ হয়। এরকম ভাবেই একদিন তালচটক পাখির দেখা পেয়েছিলাম এদের আমাদের এরোড্রামে। ওরা দল বেঁধে ঠাসাঠাসি করে বসেছিল ইলেকট্রিক তারের উপরে। বসে থাকতে থাকতেই নিজেদের মধ্যে কথা সেরে নিচ্ছিল। বেশ সুন্দর লাগে যখন নির্মল আকাশে এরা ডানা খুলে উড়ে বেড়ায়। উড়তে উড়তে অনেকটা উঁচুতে উঠে হাওয়ায় ভেসে রয় অনেকক্ষণ তারপর মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটে উড়ে যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। কিন্তু একটা সময় পর আবারও ঘুরে ফিরে এসে আগের জায়গায় বসে। এই তালচটকদের আমি বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি। অন্ডালে পাখি দেখতে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এদের বসে থাকতে দেখেছি আবার উড়ে বেড়াতে দেখেছি চেনা ছন্দে। অনেক সময় জলা জায়গার ধারে ইলেকট্রিক পোলে বা তারে বসে থাকতে দেখেছি এদের, তবে মাটিতে নামতে দেখিনি কখনও। এই নিবন্ধে পাখিটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

এদের ইংরাজি সাধারণ নাম

অ্যাশি উড সোয়ালো

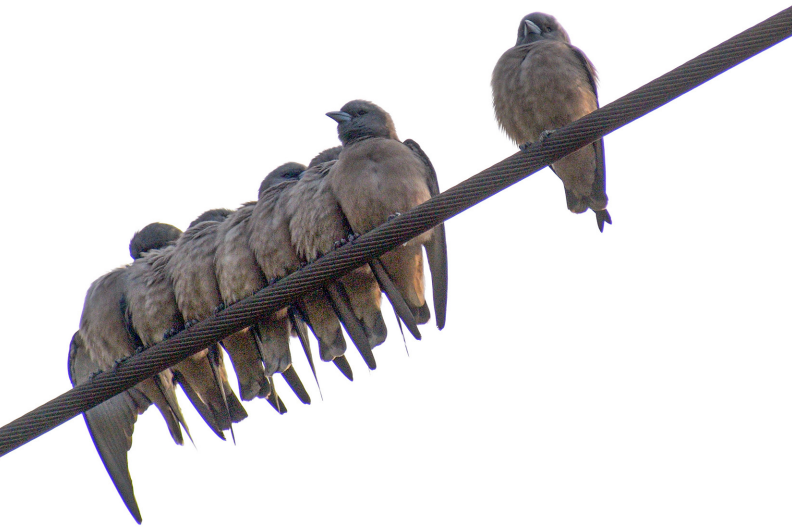

একসাথে বসে তালচটকের দল

তালচটক

Ashy Woodswallow এবং বিজ্ঞান সম্মত নাম *Artamus fuscus*। এদের বেশ কয়েকটি বাংলা নাম আছে যেমন তালচটক, বিমান পাখি এবং বন আবাবিল। ওড়ার ধরণ অন্যান্য আবাবিলদের মত হলেও এরা ভিন্ন ফ্যামিলি অ্যার্টামিডির সদস্য। এই পাখিটি পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা, তবে খুব উচ্চতার পাহাড়ি এলাকায় পাওয়া যায়না। কৃষিজমি সংলগ্ন তালগাছ, খোলামাঠ এদের বিচরণ ক্ষেত্র। এইসব এলাকায় থাকা ওভারহেড তারে একসাথে প্রায় কুড়ি থেকে ত্রিশটা পাখিকে বসে থাকতে দেখা যায়। বিশেষত সকাল ও সন্ধ্যার দিকে এদের শিকার করার সময়। এরা উড়তে উড়তে বাতাসে ভেসে থাকে এবং উড়ন্ত অবস্থায় শিকার ধরে। মূলত বিভিন্ন ধরণের কীট পতঙ্গ শিকার করে থাকে। এদের ডাক বেশ কর্কশ প্রকৃতির 'চেক-চেক-চেক' ধরণের। আকারে ছোট (19 সেমি.) এই পাখিটির পরিণত অবস্থায় মাথা থেকে গলা ও ডানা নীলচে ধূসর প্রকৃতির। পিঠের ধূসর রঙে বাদামি ভাব দেখা যায়। তলদেশ হালকা ধূসর মেশানো ফিকে গোলাপি-বাদামি। তেকোনা মোটা নীলচে ধূসর রঙের ঠোঁট। লেজ ছোট ও চৌকো প্রকৃতির। পিঠের শেষে ডানার পাশে সরু ব্যান্ড দেখা যায় সাদা রঙের। অপরিণত অবস্থায় পিঠের বাদামি রঙ বেশ ব্যাপকভাবে বোঝা যায় এবং অনেক বেশি ছিট ও ছোপ যুক্ত। এই অবস্থায় ঠোঁটও অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়। এদের প্রজনন কাল মার্চ থেকে জুলাই। এই সময় ঘাস, শিকড় ইত্যাদির সাহায্যে বাটির মত দেখতে বাসা বানায় গাছে বা কৃত্রিম নির্মাণে। দুই থেকে তিনটি ঘিয়ে বা ময়লাটে সাদা রঙের উপর লালচে-বাদামি ছিট যুক্ত ডিম পাড়ে। এদের বিস্তৃতি ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, তাইল্যান্ড, মায়নমার, মালয়েশিয়া ও চিন অবধি। প্রজাতিটি আই.ইউ. সি.এন. লাল তালিকা অনুযায়ী 'লিস্ট কনসার্ন' শ্রেণিভুক্ত। তবে প্রাকৃতিক বাসস্থান নষ্ট হওয়া এবং পতঙ্গের নিধন এদের স্বাভাবিক বাসস্থান ও খাদ্যের অভাব সৃষ্টি করছে যা অবশ্যই উদ্বেগের কারণ। ●

তালচটকের পরিবার

*লেখক **শ্রী অমর কুমার নায়ক** একজন শিক্ষক এবং বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: amarnayak.stat@gmail.com*

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের জানুয়ারী মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

জর্জটাউন-আইবিএম পরীক্ষা

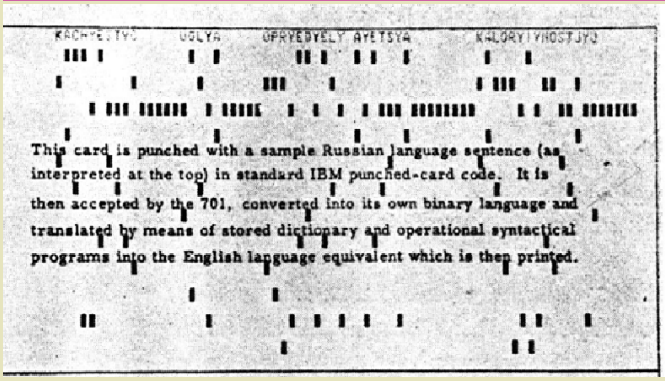

জর্জটাউন-আইবিএম পরীক্ষাটি ছিল মেশিন অনুবাদের একটি প্রভাবশালী প্রদর্শনী, যা 7 জানুয়ারী, 1954 সালে সম্পাদিত হয়েছিল। জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইবিএম যৌথভাবে তৈরি এই পরীক্ষায় ষাটটিরও বেশি রাশিয়ান বাক্যের ইংরেজিতে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাশিয়ান ভাষা জানেন না এমন একজন কম্পিউটার অপারেটর রাজনৈতিক, আইনি, গাণিতিক এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বিস্তৃত পরিসর থেকে 60টিরও বেশি রোমানাইজড রাশিয়ান বিবৃতি কম্পিউটারে ইনপুট করেন। ফলস্বরূপ রাশিয়ান বিবৃতিগুলির ইংরেজি অনুবাদগুলি একটি প্রিন্টারের মাধ্যমে ছাপা হয়ে উপস্থিত লোকেদের হাতে পৌঁছায়। অনুবাদ করার জন্য বাক্যগুলি সাবধানে নির্বাচন করা হয়েছিল। কোনও সম্পর্কযুক্ত বা বাক্য বিশ্লেষণ ছিল না যা বাক্যের গঠন সনাক্ত করতে পারে। পদ্ধতিটি বেশিরভাগই 'লেক্সিকোগ্রাফিক্যাল' ছিল একটি অভিধানের উপর ভিত্তি করে যেখানে একটি নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট নিয়ম এবং ধাপের সাথে সংযোগ ছিল। অ্যালগরিদম প্রথমে রাশিয়ান শব্দগুলিকে সংখ্যাসূচক কোডে অনুবাদ করে, তারপর সম্ভাব্য ইংরেজি শব্দ অনুবাদগুলির মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার জন্য, ইংরেজি শব্দগুলিকে পুনর্বিন্যাস করতে বা কিছু ইংরেজি শব্দ বাদ দেওয়ার জন্য প্রতিটি সংখ্যাসূচক কোডের নিম্নলিখিত কেস-বিশ্লেষণ করে। সফল হিসাবে বিবেচিত এই পরীক্ষাটি বিভিন্ন দেশের সরকারকে গণনামূলক ভাষাতত্ত্বে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেছিল। দাবি করা হয়েছিল যে তিন বা পাঁচ বছরের মধ্যে মেশিন অনুবাদ ভাষা সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য সমাধান হতে পারে। যদিও বাস্তবে এই পদ্ধতিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে অনেক দশক সময় লেগেছিলো।

পৃথিবীর দক্ষিণ চৌম্বকীয় মেরু আবিষ্কার

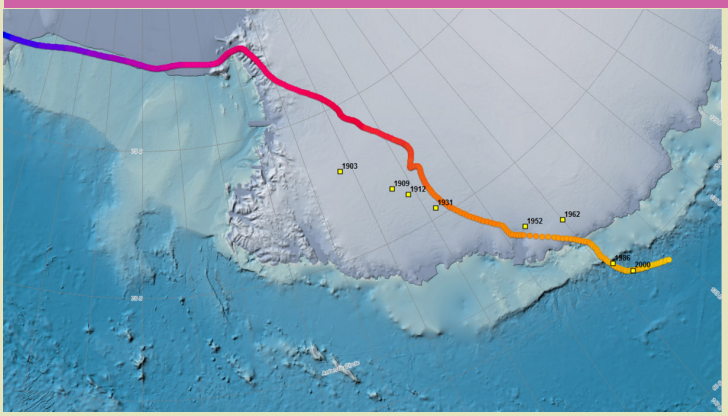

দক্ষিণ চৌম্বকীয় মেরু হল পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের সেই বিন্দু যেখানে ভূ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্ররেখাগুলি একটি লম্ব কোণে পৃষ্ঠের সাথে মিলিত হয়। এর নাম দক্ষিণ চৌম্বকীয় মেরু হলেও এটি ভৌতভাবে একটি চৌম্বকীয় উত্তর মেরু কারণ এটি একটি মুক্তভাবে ঝুলন্ত চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে। ঐতিহাসিকভাবে বেশ কয়েকজন অভিযাত্রী এর অবস্থানে পৌঁছানোর বা গণনা করার চেষ্টা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জুলস ডুমন্ট ডি'উরভিল, চার্লস উইলকস এবং জেমস ক্লার্ক রসের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মেরুটি সনাক্ত করার জন্য চৌম্বকীয় প্রবণতার প্রথম উল্লেখযোগ্য গণনা 1838 সালের 23 জানুয়ারী ডুমন্ট ডি'উরভিল অভিযানের সময় ক্লেমেন্ট অ্যাড্রিয়েন ভিনসেন্ডন-ডুমোলিন দ্বারা করা হয়েছিল। 1909 সালের 16 জানুয়ারী তারিখে ডগলাস মাওসন, এজওয়ার্থ ডেভিড এবং অ্যালিস্টার ম্যাকে শ্যাকলেটনের নিমরোড অভিযানের সময় প্রথম দক্ষিণ চৌম্বকীয় মেরুতে পৌঁছেছিলেন বলে দাবি করেন। পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের তারতম্যের কারণে মেরুর অবস্থান ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। 2005 সালে এটি 64°31'48" দক্ষিণ, 137°51'36" পূর্ব অবস্থানে ছিল এবং 2015 সালে 64.28° দক্ষিণ, 136.59° পূর্ব স্থানে এর অবস্থান অনুমান করা হয়েছিল। এটি প্রতি বছর প্রায় 10 থেকে 15 কিলোমিটার হারে উত্তর-পশ্চিমে সরে যায় এবং বর্তমানে এটি অ্যান্টার্কটিক সার্কেলের বাইরে, ডুমন্ট ডি'উরভিল স্টেশনটির নিকটে অবস্থিত।

পানামা রেল পথে প্রথম ট্রেন চলাচল

পূর্ববর্তী জরিপগুলি ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর 1850 সালে উইলিয়াম হেনরি অ্যাসপিনওয়ালের অধীনে পানামা রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়। শ্রমিকরা জঙ্গল পরিষ্কার করে, ডক তৈরি করে এবং দ্বীপটিকে একটি স্তূপ-সমর্থিত কজওয়ে দিয়ে মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত করে, যার ফলে লোকোমোটিভ, রেল এবং সরবরাহ অভ্যন্তরীণভাবে চলাচল করতে পারে। প্রথম 13 কিলোমিটার ট্র্যাকটি ভয়াবহ জলাভূমি অতিক্রম করে যার জন্য পোর্তো বেলোর কাছে একটি খনি থেকে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকফিল সংগ্রহ করতে হয়। পরিস্থিতি মারাত্মক ছিল, শ্রমিকরা প্রচণ্ড তাপ, অবিরাম বৃষ্টিপাত, রোগ এবং গভীর জলাভূমির মুখোমুখি হয়েছিল। কলেরা, ম্যালেরিয়া এবং পীতজ্বর হাজার হাজার মানুষের প্রাণ নিয়েছিল, যার মধ্যে মূল কর্মী এবং ইস্থমাস অতিক্রমকারী ভ্রমণকারীরাও ছিলেন। 1851 সালের শেষের দিকে, ভয়াবহ ক্ষতির পরে, আটকে পড়া স্বর্ণসংগ্রহকারীরা আংশিকভাবে সম্পন্ন লাইনটি ব্যবহার করার জন্য অর্থ প্রদান করলে কোম্পানিকে আর্থিকভাবে উদ্ধার করা হয়। ট্র্যাকটি ধারাবাহিকভাবে প্রসারিত হয়েছিল, যার জন্য 170 টিরও বেশি সেতুর প্রয়োজন হয়েছিল, যার মধ্যে চাগ্রেস নদীর উপর একটি বড় লোহার সেতুও ছিল। 1855 সালের জানুয়ারিতে, আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করে 76 কিলোমিটার রেলপথটি সম্পন্ন হয়েছিল। সেই বছর, 28 জানুয়ারী, পানামা রেলওয়েতে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রথম লোকোমোটিভ চলাচল করে। এটি ছিল প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রেল পথে প্রথম ট্রেন চলাচল। ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময় হিসেবে প্রশংসিত, এটি বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক রেলপথগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে। আর ফলে পানামা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র পরিণত হয় যা পরে খালের জন্য পানামাকে পছন্দ করার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। 1904 সালে পানামা খাল নির্মাণের সময় থেকে এই রেলপথে প্রভূত পরিবর্তন করা হয়। ●

হায়াকুটা ধূমকেতু আবিষ্কার

ধূমকেতু হায়াকুটাকে (আনুষ্ঠানিকভাবে C/1996 B2 নামে পরিচিত) হল 31 জানুয়ারী 1996 সালে আবিষ্কৃত একটি ধূমকেতু। এটিকে 1996 সালের মহান ধূমকেতু বলা হয়; ওই বছর 25 মার্চ পৃথিবীর থেকে এর দূরত্ব ছিল মাত্র 0.1 AU যা বিগত 200 বছরের মধ্যে সবচেয়ে কাছের ধূমকেতুগুলির মধ্যে অন্যতম। শূন্যের একটি দৃশ্যমান মাত্রায় পৌঁছানো এবং প্রায় 80° বিস্তৃত, হায়াকুটাকে রাতের আকাশে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল এবং সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে দেখা গিয়েছিল। ধূমকেতুটি অস্থায়ীভাবে বহু প্রত্যাশিত ধূমকেতু হেল-বপকে উপরে তুলে ধরেছিল, যা সেই সময়ে অভ্যন্তরীণ সৌরজগতের দিকে এগিয়ে আসছিল। ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেন দক্ষিণ জাপানের একজন অপেশাদার জ্যোতির্বিদ ইউজি হায়াকুটাকে।তিনি বহু বছর ধরে নিকটবর্তী গ্রামীণ এলাকার অন্ধকার আকাশের জন্য কাগোশিমা প্রিফেকচারে ধূমকেতুর সন্ধান করছিলেন। আবিষ্কারের রাতে তিনি আকাশ স্ক্যান করার জন্য 150 মিমি অবজেক্টিভ লেন্স সহ একটি শক্তিশালী দূরবীন ব্যবহার করছিলেন। এই ধূমকেতুটি আসলে দ্বিতীয় হায়াকুতাকে ধূমকেতু; হায়াকুতাকে কয়েক সপ্তাহ আগে ধূমকেতু C/1995 Y1 আবিষ্কার করেছিলেন। তার প্রথম ধূমকেতু (যা কখনও খালি চোখে দেখা যায়নি) এবং আশেপাশের আকাশের অংশটি পুনরায় পর্যবেক্ষণ করার সময় হায়াকুতাকে প্রথমটির মতো প্রায় একই অবস্থানে আরেকটি ধূমকেতু দেখতে পেয়ে অবাক হয়েছিলেন। প্রথমটির এত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় আবিষ্কার বিশ্বাস করতে না পেরে হায়াকুতাকে পরের দিন সকালে জাপানের জাতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাকে তার পর্যবেক্ষণের কথা জানান। পরে সেই দিন অপর একটি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কারটি নিশ্চিত করা হয়েছিল। ●

জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা

স্যার জন আর্নেস্ট ওয়াকার

প্রখ্যাত ব্রিটিশ রসায়নবিদ স্যার জন আর্নেস্ট ওয়াকারের জন্ম 7 জানুয়ারী ১৯৪১। তিনি ATP সিন্থেসের উপর তার যুগান্তকারী কাজের জন্য সর্বাধিক পরিচিত, এই কাজের জন্যই তিনি 1997 সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্সে প্রাথমিক গবেষণার পর, তিনি 1978 সালে কেমব্রিজের একটি কর্মশালায় ফ্রেড স্যাঙ্গারের সাথে দেখা করেন, যার ফলে MRC ল্যাবরেটরি অফ মলিকুলার বায়োলজিতে দীর্ঘমেয়াদী পদে অধিষ্ঠিত হন। সেখানে তিনি ফ্রান্সিস ক্রিক সহ নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীদের সাথে কাজ করেন। ওয়াকার প্রাথমিকভাবে প্রোটিন সিকোয়েন্সিংয়ের উপর মনোনিবেশ করেন এবং পরিবর্তিত মাইটোকন্ড্রিয়াল জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট করতে সহায়তা করেন। 1978 সালে তিনি মেমব্রেন প্রোটিনে প্রোটিন রসায়ন প্রয়োগের দিকে ঝুঁকে পড়েন, মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন কমপ্লেক্সের সাবইউনিটগুলিকে চিহ্নিত করেন এবং মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ সিকোয়েন্স করেন। তার সবচেয়ে প্রভাবশালী কাজের মধ্যে ছিল স্ফটিকবিদ অ্যান্ড্রু লেসলির সাথে সম্পাদিত ATP সিন্থেসের F1-ATPase অনুঘটক ডোমেনের স্ফটিক সংক্রান্ত গবেষণা। তাদের 1994 সালের কাঠামোটি অসমমিত কেন্দ্রীয় বৃন্ত দ্বারা আকৃতির স্বতন্ত্র গঠনে তিনটি অনুঘটক স্থান প্রকাশ করে, যা পল বয়ারের বাঁধাই পরিবর্তন প্রক্রিয়া এবং ঘূর্ণমান অনুঘটকের ধারণাকে শক্তিশালীভাবে সমর্থন করে। এই আবিষ্কার ওয়াকারের নোবেল পুরস্কারের ভিত্তি তৈরি করে। তারপর থেকে, ওয়াকারের দল মাইটোকন্ড্রিয়াল ATP সিন্থেসের বেশিরভাগ স্ফটিকের কাঠামো তৈরি করেছেন এবং বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যারা পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়াল কমপ্লেক্স I, মাইটোকন্ড্রিয়াল কমপ্লেক্স I এবং ভ্যাকুওলার ATPases এর প্রধান কাঠামো সমাধান করেছে।

রজার চার্লস লুই গুইলেমিন

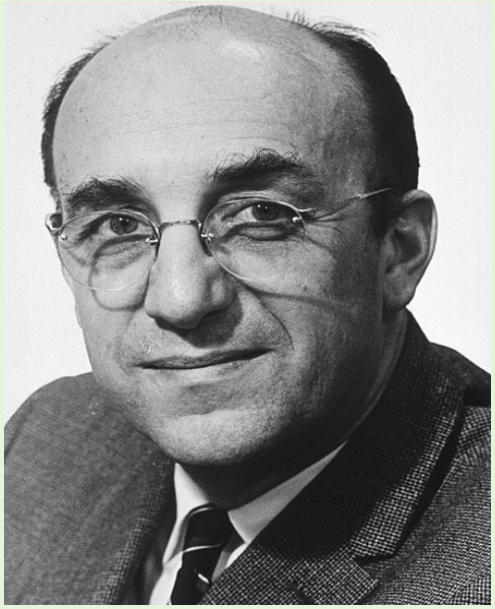

রজার চার্লস লুই গুইলেমিনের জন্ম 11 জানুয়ারী, 1924 সালে এবং তিনি ছিলেন একজন ফরাসি-আমেরিকান স্নায়ুবিজ্ঞানী যিনি আধুনিক নিউরোএন্ডোক্রিনোলজি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিলেন। তিনি 1976 সালে মার্কিন জাতীয় বিজ্ঞান পদক লাভ করেন এবং মূল নিউরোহরমোন সনাক্তকরণের জন্য 1977 সালে অ্যান্ড্রু শ্যালি এবং রোজালিন সুসমান ইয়ালোর সাথে যৌথভাবে শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 1954 সালে গুইলেমিন প্রমাণ করেন যে পিটুইটারি কোষগুলি হরমোন উৎপাদনের জন্য হাইপোথ্যালামাস থেকে সংকেতের প্রয়োজন হয়, যা হাইপোথ্যালামিক মুক্তির কারণগুলির তত্ত্বকে সমর্থন করে। এই কাজটি সম্প্রসারণের জন্য তিনি বেলর কলেজ অফ মেডিসিনে চলে যান এবং 1957 সালে শ্যালি তার সাথে যোগ দেন। পাঁচটি অনুৎপাদনশীল বছর পরে তাদের সহযোগিতা শেষ হয়ে যায় এবং দুজনেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন, প্রত্যেকেই লক্ষ লক্ষ প্রাণীর হাইপোথ্যালামি প্রক্রিয়াজাত করে—গুইলেমিন ভেড়ার মস্তিষ্ক ব্যবহার করেন, এবং শ্যালি শূকর ব্যবহার করেন—হরমোন নিঃসরণকারী ট্রেস পরিমাণ আলাদা করতে। 1969 সালে গুইলেমিনের দলের রজার বার্গাস থাইরোট্রপিন-রিলিজিং ফ্যাক্টর (TRF) সনাক্ত করার পর একটি বড় সাফল্য আসে, যার ফলে তহবিল নিশ্চিত হয় এবং আরেকটি নিয়ন্ত্রক, FRF আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত হয়। গুইলেমিন এবং শ্যালি স্বাধীনভাবে TRH এবং GnRH এর কাঠামো নির্ধারণ করেন, যার ফলে তারা নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। 1970 সালে সাল্ক ইনস্টিটিউটে যোগদানের পর, গুইলেমিন 1989 সাল পর্যন্ত নিউরোএন্ডোক্রিনোলজির জন্য ল্যাবরেটরিজ পরিচালনা করেন, সোমাটোস্ট্যাটিন আবিষ্কার করেন এবং এন্ডোরফিন বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করেন। তার শিষ্য ওয়াইলি ভ্যাল পরবর্তীতে প্রতিযোগিতামূলক আবিষ্কারের ঐতিহ্য অব্যাহত রেখে CRF কে বিশুদ্ধ করেন।

ডেভিড মরিস লি

ডেভিড মরিস লির জন্ম 20 জানুয়ারী, 1931। তিনি একজন আমেরিকান নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী যিনি নিম্ন-তাপমাত্রার পদার্থবিদ্যায়, বিশেষ করে হিলিয়াম-3-এর অতিতরলতার আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তার অগ্রণী কাজের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর এমেরিটাস এবং টেক্সাস এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক, লি 1970-এর দশকের গোড়ার দিকে রবার্ট সি. রিচার্ডসন এবং স্নাতক ছাত্র ডগলাস ওশেরফের সাথে নোবেল বিজয়ী গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। পরম শূন্যের মাত্র হাজার ভাগের এক ডিগ্রি উপরে হিলিয়াম-3 অধ্যয়ন করার জন্য একটি পোমেরানচুক কোষ ব্যবহার করে তারা অপ্রত্যাশিত অসঙ্গতিগুলি সনাক্ত করেছিলেন যা একটি অতিতরল অবস্থায় পর্যায় রূপান্তর হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। এই অগ্রগতি ত্রয়ীকে 1996 সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। হিলিয়াম-3-এর অতিতরলতার বাইরে, লির কাজ তরল, কঠিন এবং অতিতরল হিলিয়াম সিস্টেমের অনেক দিক অন্বেষণ করেছিল। তার অবদানের মধ্যে রয়েছে কঠিন হিলিয়াম-3-এ অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিক অর্ডারিং সনাক্তকরণ, জ্যাক এইচ. ফ্রিডের সাথে স্পিন-পোলারাইজড পারমাণবিক হাইড্রোজেনে নিউক্লিয়ার স্পিন তরঙ্গ আবিষ্কার করা এবং জন রেপির সাথে হিলিয়াম-4/হিলিয়াম-3 মিশ্রণের ফেজ সেপারেশন কার্ভে ট্রাই-ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট সনাক্তকরণ। তার প্রাক্তন কর্নেল গবেষণা দল অশুদ্ধ-হিলিয়াম কঠিন পদার্থ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। লি অসংখ্য সম্মান পেয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে 1976 সালের স্যার ফ্রান্সিস সাইমন মেমোরিয়াল পুরস্কার, 1981 সালের অলিভার বাকলি পুরস্কার (ওশেরফ এবং রিচার্ডসনের সাথে যৌথভাবে), এবং 1997 সালের গোল্ডেন প্লেট পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। তিনি ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস এবং আমেরিকান একাডেমি অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের সদস্যও। ●

রাজা রামান্না

রাজা রামান্নার জন্ম 28 জানুয়ারী 1925 সালে এবং তিনি একজন ভারতীয় পারমাণবিক পদার্থবিদ ছিলেন। তিনি 1960-এর দশকের শেষের দিকে এবং 1970-এর দশকের গোড়ার দিকে ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচির পরিচালক ছিলেন, যার পরিণতি 18 মে 1974 সালে ভারতের প্রথম সফল পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা, স্মাইলিং বুদ্ধ সম্পন্ন হয়। রামান্না হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার অধীনে কাজ করেন এবং 1964 সালে পারমাণবিক কর্মসূচিতে যোগ দেন। পরে 1967 সালে এই কর্মসূচির পরিচালক হন। রামান্না পারমাণবিক অস্ত্রের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্প্রসারণ ও তত্ত্বাবধান করেন এবং ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র (BARC) এর বিজ্ঞানীদের দলের দায়িত্বে ছিলেন যারা 1974 সালে প্রথম পারমাণবিক যন্ত্রের পরীক্ষা ডিজাইন ও পরীক্ষা পরিচালনা করেছিল। রামান্না চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গবেষণাও সহজতর করেছিলেন। তিনি ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা গবেষণা সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার মহাপরিচালক, পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পারমাণবিক শক্তি বিভাগের সচিব-এর মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি 1990 সালে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী হন। তিনি 1997 থেকে 2003 সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার কর্মজীবনের শেষের দিকে তিনি পারমাণবিক বিস্তার এবং পরীক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্ছার হন। ●

কলকাতার আসন্ন বিপদ

এখন কলকাতা বা সন্নিহিত দক্ষিণ বঙ্গে বন্যা খুবই সাধারণ খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর অন্যতম কারণ কি পূর্ব কলকাতার জলাভূমির হারিয়ে যাওয়া? পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ জলাভূমি এক রহস্যপূর্ণ স্থান। শীতকালের পিকনিক স্থান হিসাবে জনপ্রিয় নলবন বা নুনের ভেরি কিন্তু একটি 'রামসার সাইট' তালিকাভুক্ত আন্তর্জাতিকভাবে সংরক্ষিত জলাভূমি এবং পৃথিবীর একটি বিরল বিস্ময়!

বর্তমান ভারতে রামসার সাইটের সংখ্যা চল্লিশের বেশি, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আছে দু'টি। প্রথমটি পুর্ব কলকাতার জলাভূমি এবং দ্বিতীয়টি সুন্দরবন। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রামসার সাইটটি আমাদের চোখের সামনেই যেন অদৃশ্য হয়ে রয়েছে। ভৌগলিকভাবে কলকাতা ভারতের অন্যতম নিচু শহর। কলকাতার পশ্চিমে গঙ্গা, অথচ শহরের ঢাল পুবে। প্রতিদিন শহরে প্রায় সাতশো মিলিয়ন লিটার তরল বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এই পরিমাণ বর্জ্যকে সাফাই করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে নিকাশি প্ল্যান্ট তৈরি করা হয়, যা অন্য সব শহরে দেখা যায়। কিন্তু কলকাতায় এমন একটিও 'প্ল্যান্ট' নেই বা ছিলও না কোনোকালে। অথচ, নোংরা জলে সেরকম বিশাল মাপের দূষণের কোনও খবর আসে না। তাহলে ওই অতখানি নোংরা জল যায় কোথায়?

কলকাতার বর্জ্য জলের নিকাশি কোথায়, কলকাতার কেউ জানে না। কলকাতায় যেন সেই জল ম্যাজিকের মত 'ভ্যানিশ' হয়ে যায়। শেষে একদিন চোখে পড়লো কলকাতার পুবপ্রান্তের এই জলাভূমি। আপাতভাবে দেখলে মনে হয় জলাজমি—আমাদের ভাষায়, 'নুনের ভেড়ি'—কোনো কাজে আসে না। কিন্তু সেখানেই পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হলো। বর্জ্যজল প্রকৃতপক্ষে 95% জল এবং 5% জীবাণু। দেখা গেলো, এই বিশাল জলাভূমিতে ওই বর্জ্যজলের জীবাণু জলজ বাস্তুতন্ত্রে শৈবাল ও মাছের খাদ্যে পরিণত হয়। ফলে স্রেফ প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রেই সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্যে ও সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পুরো জল পরিশুদ্ধ অবস্থায় চলে আসে, বিপুল মাছের ভাণ্ডার তৈরি করে—পুরোটাই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে—বিন্দুমাত্রও শোধন করাতে হয় না!

একসময় নগরায়ণের দাবি মেনে গঙ্গা থেকে পলি তুলে সেই লবণ হ্রদের প্রায় অর্ধেকটা ভরাট হয়েছিল, বাকিটা ছাড়া ছিল। ডাচ সংস্থা নেডেকো ও একদল যুগোস্লাভ ইঞ্জিনিয়ার দুর্দান্ত পরিকল্পনা করে নগর 'ডিজাইন' করেছিলেন, যা বর্তমানে সল্টলেক। ক্রমে সল্টলেকের আকার বাড়তে শুরু করল, শুরু হয় অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ। 1990 সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেন—ওই জলাভূমি বুজিয়ে একটা বিশাল বড় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। তখন হাইকোর্টে মামলা করল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'PUBLIC' (People United for Better Living in Calcutta)। 1992 সালে দেশের অন্যতম প্রথম পরিবেশবান্ধব রায়টি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট—বিচারপতিরা ঘোষণা করলেন, ওই জলাভূমি বোজানো চলবে না, তাকে সংরক্ষণ করতে হবে।

সম্ভবত এই জলাভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক জলশোধক! কলকাতা ময়দান যদি কলকাতার ফুসফুস হয়, তাহলে এই জলাভূমিই হবে তার কিডনি। প্রায় তিরিশ হাজার মানুষের জীবিকা সরাসরিভাবে জড়িত এই জলাভূমির সঙ্গে। মাছের পাশাপাশি, বিপুল পরিমাণ শাকসবজির জোগান দেয় এই এলাকা। পাশাপাশি, বিপুল পরিমাণ অক্সিজেনের জোগানও দেয় এই জলাভূমি। কার্যত একটি পয়সাও খরচ না করে দূষিত জল নিয়ে সে ফেরত দেয় টাটকা জল, মাছ, শাকসবজি, অক্সিজেন। এবং এর সবচেয়ে রহস্যময় ভূমিকা হল বন্যা নিয়ন্ত্রণ। যে বিপুল পরিমাণ জলে প্রতিদিন ভেসে যেতে পারত কলকাতা, তার বেশিরভাগটাই টেনে নেয় এই জলাভূমি, তারপর অবশিষ্ট চলে যায় বিদ্যাধরী নদীতে। তাই অন্তত বছর দশেক আগে অবধি মুম্বই বা চেন্নাই নিয়মিত বন্যায় ভেসে গেলেও দিব্যি টিকে যেত কলকাতা। আজ ভেঙে পড়েছে পুরো ব্যবস্থাটাই। চলছে যথেচ্ছ জলাভূমি ভরাট, নগরায়ণ। চলছে দূষণ। ফলে নজিরবিহীন সংকটের মুখে পূর্ব কলকাতার এই জলাভূমি। সামান্য বৃষ্টি হলেই আজ ভেসে যাচ্ছে কলকাতা। এটাই আজ কলকাতার সবথেকে বড় বিপদ।

NAZARBAYEV UNIVERSITY

www.nu.edu.kz

ADMISSIONS OPEN FOR 2026-27 SESSION

#1 Ranked University in Central Asia
(Times Higher Education Ranking)

Situated in Astana, Kazakhstan | Safe & Modern University
3-Hour flight from Delhi, Mumbai

World-class Residential Research oriented university
Fully English-Medium | International Faculty & Infrastructure

PROGRAMS & TUITION FEES

Undergraduate Programs:	$15,000	Doctoral Programs:	$23,500
A Six-Year Undergraduate Medical Program:	$15,000	Doctor of Medicine:	$30,000
Master's Degree Programs*:	$16,000	Residency Programs:	$11,200

*except for programs of the Graduate School of Business.

MBBS | MD | RP | NURSING | BA | MA | BBA | MBA | BSC | MSC | BTech | MTech | PhD

SCHOLARSHIPS AVAILABLE
| Partial | Full Fee Seats

- Qualifying degree
- valid passport | IELTS

REGISTER WITH www.snsols.com

In India, we are represented by **S&N Solutions.** For further information, reach out at
E: info@snsols.com or **M: +91 98111 03745 | www.snsols.com**

2026

JANUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

FEBRUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

MARCH

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

APRIL

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

JUNE

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

JULY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AUGUST

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

SEPTEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

OCTOBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

DECEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

List of Holidays

26 Jan	Mon	Republic Day
04 Mar	Wed	Holi
26 Mar	Thu	Ram Navami
15 Aug	Sat	Independence Day
28 Aug	Fri	Raksha Bandhan
04 Sep	Fri	Janmashtami
02 Oct	Fri	MG Birthday
20 Oct	Tue	Dussehra
08 Nov	Sun	Diwali
24 Nov	Tue	Kartik Purnima
25 Dec	Fri	Christmas

লেখকদের জন্য: বাংলা বিজ্ঞান কথায় অনধিক 1200 শব্দের মধ্যে বাংলায় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের গল্প, কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখা পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হাতে লেখা বা ইউনিকোড ফন্টে টাইপ করা পাণ্ডুলিপি এবং পৃথকভাবে লেখা সংক্রান্ত ছবি পাঠানোর জন্য Bangla Bigyan Katha, Shanti Foundation, UG 17, Jyoti Shikhar, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110060 ঠিকানায় চিঠি পাঠান বা ইমেল করুন: amitesh.shantifoundation@gmail.com। প্রতিটি লেখার শেষে অবশ্যই লেখক পরিচিতি ও লেখকের ইমেল উল্লেখ করুন।